সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন

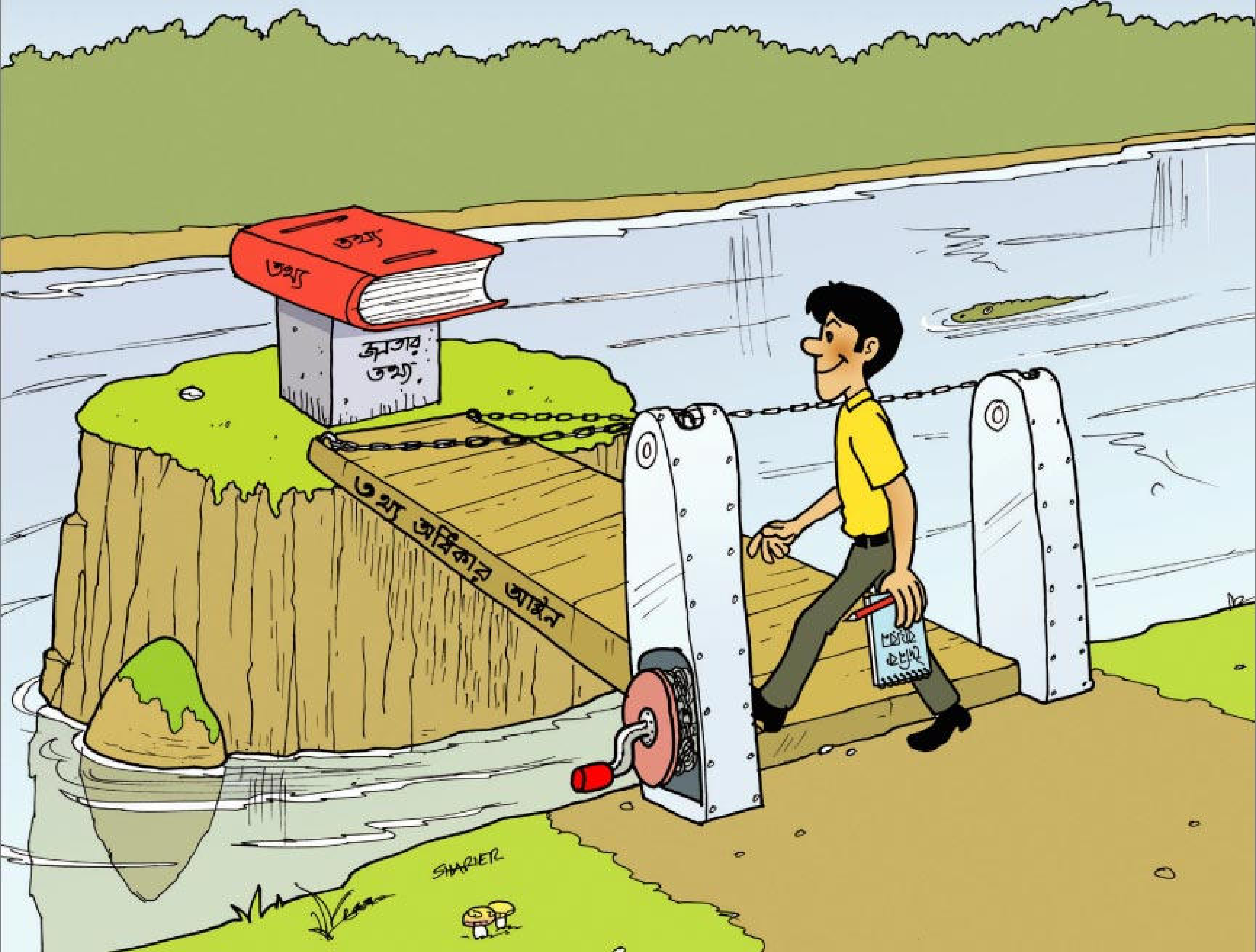

শাহানা হুদা রঞ্জনা
সুকান্ত গুপ্ত অলক

সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন

শাহানা হুদা রঞ্জনা
সুকান্ত গুপ্ত অলক

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

PROGATI Promoting governance, accountability, transparency and integrity

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : জুন ২০১০

কার্টুন : শাহরিয়ার খান

ISBN : 978-984-33-1810-7

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
২/৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ই-মেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা **১**

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কীভাবে হলো ৩
কেন দরকার তথ্য অধিকার আইন ৫
তথ্য অধিকার আইন ও সাংবাদিকতা ৬
তথ্য অধিকার আইন কিছু পাল্টে দেবে কি? ৮
সাংবাদিকদের জন্য লক্ষণীয় ৯
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ১০
প্রায়োগিক ক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকদের সুবিধা ১১
সাংবাদিকের তথ্যপ্রাপ্তি ১২
সাংবাদিকদের সুযোগ ও প্রয়োগ ১৪

আইনের সহজপাঠ **১৫-৪৯**

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সংজ্ঞা ১৫
তথ্য অধিকার কী ১৫
তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য কী ১৬
তথ্য সংরক্ষণ ১৬
তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ১৭
ইউনিয়ন পরিষদও কর্তৃপক্ষ ১৮
আইনে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষসমূহ এবং উদাহরণ ১৯
আপিল কর্তৃপক্ষ ১৯
তথ্য প্রকাশ ২০
কিছু তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় ২৪
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ভালো দিকসমূহ ৩৮
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর দুর্বল দিকসমূহ ৪১
তথ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রকাশিত তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়া ও সময়সীমা ৪৬
আপিল প্রক্রিয়া ৪৮
তথ্য কমিশনে অভিযোগ প্রক্রিয়া ৪৯

পরিশিষ্ট **৫০-৫২**

তথ্য অধিকার আইন ও সরকারি গোপনীয়তা আইন ৫০

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন ৫১

কেস স্টাডি **৫৩-৫৯**

তথ্যসূত্র **৬০**

সংযুক্তি **৬১-৯২**

সংযুক্তি ১ : কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে একটি চিঠির নমুনা ৬১

সংযুক্তি ২ : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেট ৬৩

সংযুক্তি ৩ : তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেট ৮৪

সংযুক্তি ৪ : তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ (সংশোধন) বাংলাদেশ গেজেট ৯১

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের ৮৮তম দেশ, যেখানে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। নতুন এই আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে এ সম্পর্কে সকল পর্যায়ে ধারণা তৈরি করা জরুরি। যেসব দেশে ইতোমধ্যেই এই জনকল্যাণকর আইনটি কার্যকর রয়েছে, সেসব দেশে আইন বাস্তবায়নের প্রথম দিকে অনেক ধরনের জটিলতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আইনের ব্যবহার শুরু হলে ধীরে ধীরে তা কার্যকর একটি আইনে পরিণত হয়। আমাদের দেশেও আইনটি যদি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলেই বাস্তব ক্ষেত্রে তা কতটকু ফলপ্রসূ হচ্ছে, নির্ণয় করা যাবে। আইনটি যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা হবে—ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যাবে না—কোথায় এর সফলতা, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও উপযোগিতা।

'দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা' বিষয়ে গত এক বছর ধরে এমআরডিআই-এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বারবার একটি কথা এসেছে—আইনটি সাংবাদিকদের জন্য কি না। আইনটি মূলত মানুষের কল্যাণের জন্য; আর সাংবাদিকতার নৈতিকতার মধ্যেই আছে জনকল্যাণের জন্য সত্যের অনুসন্ধান ও প্রচার এবং সব সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির জন্য ন্যায্যভাবে তা সরবরাহ করা। তাই আইনটি সাংবাদিকদের জন্যও সমভাবে কাজে আসবে। নানা কারণেই একজন সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনকে সাদরে গ্রহণ করতে চাইবেন না—কারণ, দিনের কাজ শেষ করার ডেডলাইন, সূত্রের প্রতি নির্ভরশীলতা—এসব সীমাবদ্ধতা তার রয়েছে। সেজন্য তথ্য অধিকার আইন তাকে দিনের রিপোর্টিংয়ে কোনোভাবে সাহায্য করবে না হয়তো, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে আইনটি তাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে পারে। অপরদিকে জণগণ যখন তথ্য চেয়ে পাবে বা পাবে না, তখন সে বিষয়টিও হতে পারে সাংবাদিকদের প্রতিবেদনের বিষয়। আইনটির মাধ্যমে অর্জিত তথ্য সাংবাদিকের পেশাদারিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে, পাশাপাশি তাকে তথ্য-প্রমাণ দিয়েও সুরক্ষিত করবে।

'সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন' বইটিতে চেষ্টা করা হয়েছে, সাংবাদিকরা আইনটি ব্যবহার করে কীভাবে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন তা তুলে ধরতে। জনগণের হয়ে সাংবাদিকরাই পারেন তথ্য অধিকার আইনের শক্তিশালী দিকগুলো ব্যবহার করে দুর্নীতি-অনিয়ম, অন্যায়-অবহেলা ও বঞ্চনার খবর তুলে আনতে।

বইটিতে দুটো দিক রয়েছে—আইনটির সহজ ব্যাখ্যা আর সাংবাদিকরা কীভাবে আইনটি ব্যবহার করতে পারবেন সে দিকটিও। সাংবাদিকদের জন্য অংশটি লিখেছেন সুকান্ত গুপ্ত অলক, যুগ্ম সম্পাদক, দেশ টিভি এবং আইনের সহজ পাঠটি লিখেছেন শাহানা হুদা রঞ্জনা, কো-অর্ডিনেটর, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। বইটির আইনের অংশটি দেখে মতামত দিয়েছেন ব্যারিস্টার তানজীব-উল আলম। পুরো বইটি পড়ে সার্বিকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন ফারজানা নাঈম, পরিচালক, গভর্নেন্স, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন; ড. অনন্য রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট এবং মো: মইনুল কবির, আইন বিশেষজ্ঞ। বইটিতে কী কী বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে সার্বিকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রায় ৩০ জন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সাংবাদিকদের জন্য বইটি প্রকাশ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য ইউএসএআইডি-প্রগতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কীভাবে হলো

১৯৮৩ সাল, দেশে তখন সামরিক শাসন। নানাবিধ নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সভা-সমাবেশ-মিছিল বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। পত্রপত্রিকাগুলোও চাপ ও হুমকির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। যদিও সব সামরিক আমলের মতোই এই সময়েও সরকার থেকে জেহাদ ঘোষণা করা হয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আওয়াজ তোলা হয় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি কমাতে নাগরিকদের ক্ষমতায়নের কথা বলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে একটি সুপারিশমালা চূড়ান্ত করতে সরকার গঠন করে 'বাংলাদেশ প্রেস কমিশন'। ১৯৮৪ সালে কমিশন রিপোর্ট দেয়, যাতে 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট' নামে একটি আইন করার জন্য সরকারের কাছে লিখিত মতামত তুলে ধরা হয়। এই প্রেস কমিশনের রিপোর্টেই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তথ্য অধিকার তথা স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়া ও তা প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। লক্ষণীয়, সামরিক সরকারের গঠন করা একটি কমিশন হলেও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি তারা এড়িয়ে যেতে পারেনি। যদিও রিপোর্ট দেওয়ার মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল এবং সে রিপোর্টের আলোকে কোনো কাজও হয়নি। *(১৯৮৩ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে বাংলাদেশ প্রেস কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৮৪ সালে তারা সরকারের কাছে রিপোর্ট দেয়। প্রবীণ আইনজীবী ও রাজনীতিক আতাউর রহমান খান ছিলেন এর চেয়ারম্যান। সদস্য ছিলেন দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট পত্রিকা-সম্পাদক।)*

এরপর ১৯৯৯ সালে একটি সেমিনার থেকে তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আইন প্রণয়নের কথা উঠে আসে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্টসহ আরো কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন ভারতের কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরই), দিল্লি-এর সহযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ঢাকায় তিন দিনের ঐ সেমিনারের আয়োজন করে। এরকম একটি বড় ফোরাম থেকেই এনজিও কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, গণমাধ্যমকর্মী ও শিক্ষকরা প্রথম তথ্য অধিকারের দাবিকে সামনে নিয়ে আসেন।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত আছে। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক চুক্তিপত্রে (International Covenent on Civil and Political Rights – ICCPR) একে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ এই চুক্তিপত্রে সম্মতি জানায়। ফলে দেশের সব নাগরিকের তথ্য-প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ ল' কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০২ নামে একটি কর্মপত্র প্রণয়ন করে। কিন্তু ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই কর্মপত্রের আলোকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি দেখা যায়নি।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে তা বোঝার জন্য ২০০৫ সালে একটি বেসরকারি সংগঠনের[১] পক্ষ থেকে জরিপ চালানো হয়। এই মূল্যায়ন জরিপের ওপর ভিত্তি করে 'বাংলাদেশে তথ্য অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা : চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবতা' শীর্ষক একটি সেমিনারও[২] অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি ল' কমিশনের করা কার্যপত্রের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলে তথ্য অধিকার আইনের খসড়া তৈরির কাজ।

জরিপের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করা হয় যে, জনগণ তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝে এবং তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কেই বা তাদের অভিমত কী? দেখা গেল, অধিকাংশ মানুষই মনে করে, তথ্য অধিকার অনেকটাই গণমাধ্যমের ব্যাপার এবং সাংবাদিকদের জন্য। তারা মনেই করে করে না যে, এটা জনগণের মৌলিক অধিকার এবং উন্নয়নের একটি হাতিয়ার। তবে র‌্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট চালানোর পর দেখা যায় যে অনেক প্রতিষ্ঠান, যেমন—এমএমসি, কোস্ট ট্রাস্ট, ডি-নেট, বিএনএনআরসি এবং আরও অনেকে 'আন্তর্জাতিক প্রেস ফ্রিডম ডে' পালন করার মাধ্যমে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

২০০৫ সালে তথ্য অধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য আরও একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন[৩] হয়। সম্মেলনে একদিকে যেমন দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অতিথিরা অংশ নেন, অন্যদিকে তৎকালীন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও এতে যোগ দেন। প্রত্যেকেই এ সময় একটি তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন খসড়া আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনটি কোর গ্রুপ গঠনে সহায়তা করে। আইনবিষয়ক কোর গ্রুপ যে খসড়া তথ্য অধিকার আইনটি তৈরি করে, সেটা নিয়ে সাংবাদিক, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ে অনেকবার আলোচনা হয়। ওয়েবসাইট ও পত্রিকাতেও তা প্রকাশ করা হয়। খসড়া আইনটি তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ড. শামসুল বারী, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, অ্যাডভোকেট শাহ্‌দীন মালিক, অ্যাডভোকেট এলিনা খান, অধ্যাপক আসিফ নজরুল ও ব্যারিস্টার তানজীব-উল আলম। ব্যারিস্টার তানজীব ও অধ্যাপক আসিফ বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত সংযুক্ত করে ২০০৭ সালে খসড়াটির চূড়ান্ত রূপ দান করেন। ভারতের সিএইচআরআই-ও আর্টিকেল ১৯-এর খসড়া বিষয়ে তাদের মতামত দেয়। সিএইচআরআই ভারতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালনকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

২০০৭-এ আইনবিষয়ক কোর গ্রুপ খসড়া আইনটি তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ল' কমিশনের কর্মপত্র ও আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ২০০৭-এর ডিসেম্বরে 'গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত

---

[১] মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের জরিপ Situation Analysis of Right to Information in Bangladesh: Realities and Opportunities

[২] মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত Rapid Assesment Report on Situation of Access to Information in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

[৩] কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (CHRI) দিল্লি এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত সম্মেলন 'RTI : National Regional Perspectives'

বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সম্মেলনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অচিরেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হবে বলে ঘোষণা দেন। তথ্য মন্ত্রণালয় খসড়াটি চূড়ান্ত করার আগে মতামত নেয়ার জন্য তা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে এবং সেমিনার আয়োজন করে। এ পর্যায়ে ২০ অক্টোবর ২০০৮ রাষ্ট্রপতি তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করেন। পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করলে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ নবম জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন বিল ২০০৯ পাস হয়। ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিলে ৬ এপ্রিল আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই থেকে আইনটি কার্যকর হয়। আর আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২ জুলাই গঠন করা হয় তথ্য কমিশন।

কেন দরকার তথ্য অধিকার আইন

ব্রিটিশ শাসনামলে ঔপনিবেশিক সরকার কখনো চাইত না, জনগণ সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্ন করুক বা গভীরভাবে জানুক। সরকার এজন্য জনগণের সঙ্গে সরকারের একটি ব্যবধান তৈরি করেছিল, যাতে শাসন ও শোষণ দুই কাজেই সুবিধা হয়। সরকারি কর্মকর্তারা কোনোভাবেই যেন জনগণের সঙ্গে তাদের তথ্য বিনিময় না করেন তা কার্যকর করতে প্রণয়ন করা হয় 'দি অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩'। দাপ্তরিক গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের নিমিত্তে এই আইনকে সার্বিক তথ্য গোপনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। তবে ব্রিটিশ শাসন অবসানের ৬৩ বছর পার হয়ে গেলেও সেই আইন বাংলাদেশে এখনো রয়ে গেছে। আরও রয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণবিধি-রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ ও গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস ১৯৭৬।

এই অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ধুয়া তুলে বহু বছর সাংবাদিকদের সাধারণ তথ্য দিতেও গড়িমসি করেছেন সরকারি কর্মকর্তারা। খুব স্পষ্ট করে বলাও হতো না—কোন তথ্য দেওয়া যাবে, কোন তথ্য দেওয়া যাবে না। সংবাদকর্মীরা খুব সাধারণ কোনো প্রশ্ন করলেও সরকারি কর্মকর্তারা এই আইনের কথা বলে তা এড়িয়ে যেতেন।

'দি ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস চার্টার ১৯৪৮'-এর ১৯ নম্বর ধারায় (Article) স্পষ্টভাবেই মত প্রকাশের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারের আওতায় শুধু মত প্রকাশ করা নয়, গণমাধ্যমের মাধ্যমে যেকোনো তথ্য ও ধারণা জানার, গ্রহণ করার এবং ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এই চার্টারে স্বাক্ষর করেছে ১৯৭২ সালে। একই ঘোষণা লক্ষ করা যায়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে (International Covenant on Civil and Political Rights—ICCPR), মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসংক্রান্ত ইউরোপীয় চুক্তিপত্রে (European Covenant on Human Rights and Fundamental Freedoms—EHR) এবং মানবাধিকারসংক্রান্ত মার্কিন চুক্তিপত্রে (American Covenant or Human Rights—AMR)। বাংলাদেশ ১৯৬৬ সালের 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে ২০০০ সালে। এই চুক্তি অনুসারে সরকার জনগণের কাছে সব ধরনের তথ্য উন্মুক্ত রাখতে বাধ্য।

বাংলাদেশের সংবিধান তথ্য অধিকার বা তথ্যে প্রবেশাধিকারকে অধিকার হিসেবে ঘোষণা না করলেও, সংবিধানের ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদ প্রচ্ছন্নভাবে জনগণের জানার অধিকারকে স্বীকার করেছে। ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। একইভাবে ১১ অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যা ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানুষের মর্যাদা ও জীবনের অধিকারকে সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

মানুষ যখন বুঝতে পারবে, তাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে জানাটা তাদের অধিকার এবং এই অধিকারটা আদায়ের জন্য একটি আইন আছে—তখনই তারা খুব সহজেই এই আইনটি ব্যবহার করতে শুরু করবে। আর মানুষ যখন তার জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে আইনগতভাবে দাবি জানাবে, তখন কর্তৃপক্ষ আর চুপ থাকতে বা তথ্য গোপন রাখতে পারবে না। অন্যদিকে সাংবাদিকরাও অকার্যকর তথ্য সংরক্ষণ-পদ্ধতি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি না থাকায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হন প্রায়ই। তথ্য অধিকার আইনের অধীনে নথি সংরক্ষণের ওপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ওপরেও।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইন দিয়ে ক্ষুণ্ন করা যাবে না। তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য আইনে বাধা থাকলে, তথ্য অধিকার আইনই প্রাধান্য পাবে। এমনকি অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনও এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

একজন সংবাদকর্মী সাধারণত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা সমস্যা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরেন। জনগণ হয়তো সব সময় সরকারের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ নাও করতে পারেন—তখন গণমাধ্যম সেই তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। সে ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীরাই পারবেন তথ্য অধিকার আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সড়ক, কালভার্ট, সেতু নির্মাণ অথবা প্রকল্পের ব্যয়—এসব তথ্য জনগণের পাশাপাশি সাংবাদিকরাও আদায় করতে পারবেন জোরের সঙ্গে এই আইনের বলেই। সরকারি কর্মকর্তারা, রাজনীতিবিদরা বা স্থানীয় প্রশাসন এবং এনজিওগুলোও বাধ্য থাকবে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে, প্রকল্পের তথ্য প্রকাশ করতে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির একটি সংস্কৃতি চালু হবে।

সংবাদকর্মীদের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে দুটি—এক. জনগণের ভেতর এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং দুই. নিজেদের পেশাগত কাজে এই আইন ব্যবহার করার চর্চা বাড়ানো।

তথ্য অধিকার আইন ও সাংবাদিকতা

তথ্য অধিকার আইন করার পক্ষে বাংলাদেশে যখন জনমত তৈরির কাজ শুরু হয় তখন থেকেই এর সঙ্গে সক্রিয় রয়েছেন সাংবাদিকরা। সাংবাদিকদের এই সোচ্চার ও বলিষ্ঠ ভূমিকা আজকে তথ্য আধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরেও আছে। খুব সরল বিবেচনায় সাংবাদিকদের এই

জোরালো অবস্থান খুবই স্বাভাবিক, থাকা উচিত এবং থাকবেই। কিন্তু তার পরও প্রশ্নটি উঠেছে যে, তথ্য অধিকার আইন কি সাংবাদিকদের জন্য?

সহজ কথায় এর উত্তর 'না'-ই হবে, কেননা এটি সাংবাদিক বা সাংবাদিকতার জন্য কোনো আইন নয়। তার পরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আইন সাংবাদিকতার জন্য উৎকর্ষ হবে, ভিন্ন অর্থে একজন সাংবাদিকের জন্য তথ্য আহরণে সহায়ক হবে। আবার এই আইনের ব্যাপক প্রচলন, ব্যবহার ও প্রয়োগ সাংবাদিকতার নতুন ক্ষেত্র বা একজন সাংবাদিকের জন্য নতুন নতুন সংবাদ-তথ্য সামনে নিয়ে আসবে।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল পাওয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রটি আসলে জনগণের জন্য। এই আইন মানুষের জানার অধিকারের রক্ষাকবচ। সংবিধান জনগণকে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। *(সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ : (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতোখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততোখানি বাতিল হইবে।)*

আর জনগণের এই ক্ষমতাকে সুরক্ষা দেবে তার তথ্য জানার অধিকারের আইন। সংবিধান জনগণের এই অধিকারকেও স্বীকৃতি রয়েছে। তাই তথ্য অধিকার মৌলিক অধিকারও হিসেবেও বিবেচিত। বাংলাদেশ সংবিধানে তথ্য সংগ্রহ, তথ্যপ্রাপ্তি এবং ব্যবহারে জনগণের ক্ষমতার বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত। তথ্য জানার অধিকার পাওয়ায় জনগণ এখন তাদের অন্য মৌলিক অধিকারগুলো চর্চা করতে, মূল্যায়ন করতে ও ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সমর্থ হবে। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এই ঘোষণার পরও সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদও নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতার অধীনে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে, বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। যা একই সঙ্গে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও তার তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকেও স্বীকৃতি দেয়। *(সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৯ : (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।*

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের জন্য কথাবার্তা শুরু হয়েছে স্বাধীনতা লাভের বহু বছর পর। সাংবাদিকসহ নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেই এই আইন করার দাবিটি প্রথম উচ্চকিত হয়। কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন এ জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম চালাতে থাকে। সাংবাদিকরাও যুক্ত হন এই কার্যক্রমের সঙ্গে। প্রচার, অ্যাডভোকেসি ও জনমত সংগঠন নীতিনির্ধারক মহলে সাড়া ফেললে ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির পর ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে বিল পাসের পর তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়। তবে এখনো তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সেরকম সুফল বয়ে আনেনি। সাংবাদিক মহল বা সমাজের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের মধ্যেও তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি।

তবে তথ্য অধিকার আইনের জন্য সাংবাদিকদের কোনো তাড়না থাকার বিষয়টি গৌণ। বরং জনগণের মধ্যে, সর্বস্তরে এই আইনের প্রয়োজনীয়তার তাড়নাটা পৌঁছে দেয়া জরুরি।

তথ্য অধিকার আইনের প্রায়োগিক সাফল্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে খুবই লক্ষণীয়। তথ্য অধিকার আইন যে সাংবাদিকদের জন্য নয়, তা নিয়ে সে দেশে কোনো বিভ্রান্তি নেই। যদিও তথ্য অধিকার আইন করার দাবিতে ভারতে যখন জনগণের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তখন বিভ্রান্তি পেয়ে বসে সরকারের মধ্যে। নব্বইয়ের দশকে তথ্য অধিকার আইনের জন্য জনমত সংগঠনে সামাজিক আন্দোলনের ব্যাপকতা পত্রপত্রিকা, মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পেলে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি বা আমলারা সেটিকে উল্টো বুঝে 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের কিছু ধারা সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জন্য সমস্যাসংকুল হিসেবে প্রতীয়মান হয়, যা তথ্য প্রাপ্তির অবাধ প্রবাহকে নিশ্চিত করে না। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হলে পিছু হটে সরকার। এর পরে সেই আইন বাতিল করে ভারতে পাস হয় তথ্য অধিকার আইন। (*ভারতে ২০০২ সালে প্রথম 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট' বলবৎ করা হলেও পরে তা বাতিল করে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক, প্রগতিশীল ও কার্যকর বিবেচনায় এনে ২০০৫ সালে 'তথ্য অধিকার আইন' চালু হয়।*) এখন এই আইনের সুফল পাচ্ছে জনগণ, আর সাংবাদিকরা পাচ্ছেন এই আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা থেকে চমৎকার সব সংবাদ-তথ্য।

অর্থাৎ সরাসরি তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের কাজের ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী নয়, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। কোনো দিনের রিপোর্ট লেখায় এর ব্যবহার তাই খুব একটা দৃশ্যমান হবে না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের ভিন্নভাবে উপকারে আসতে পারে, সহযোগিতা করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ রিপোর্ট, ইনডেপথ রিপোর্ট বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার জন্য এই আইনের ব্যবহার কাজে আসতে পারে। তবে কোন পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এসব রিপোর্ট করবেন, তা নির্ধারণ করতে নিজ নিজ বার্তা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আলাপ করে নেয়া ভালো।

তথ্য অধিকার আইন কিছু পাল্টে দেবে কি?

বাংলাদেশে সাংবাদিকরা যেভাবে রিপোর্ট করে থাকেন, তাতে তথ্য অধিকার আইন চালু হওয়ার পর সেভাবে কাজ করার প্রকৃতি কি পরিবর্তিত হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। সাংবাদিকরা সেভাবেই কাজ করবেন, যেভাবে করছেন। সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি, পেশাগত সম্মান, আদর্শ ও আনুগত্য অটুট রেখেই কষ্টসহিষ্ণু পথে একজন সংবাদকর্মীকে কাজ করে যেতে হয়। তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের এই পথচলায় নতুন করে কিছু যোগ করে দেবে না। একজন সাংবাদিক যখন একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য কাজ করেন তখন তাকে তার চিরচেনা পথেই যথেষ্ট সময় নিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে তথ্যসূত্রের কাছে যেতে হয়, আহরণ করতে হয় সংবাদ-তথ্য, যাকে সহজ ভাষায় সাজিয়ে সেই প্রতিবেদন লিখতে হয়। প্রকাশিত এ রকম অনেক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে সেই রূপটিই ধরা পড়ে। এখন তথ্য অধিকার আইন হয়ে যাওয়ার পর মনে হয়, নির্দিষ্ট এ রকম রিপোর্টের তথ্য

আহরণে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ইচ্ছা করলে ঐ আইনের আশ্রয় নিলেও নিতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে ঐ আইনের প্রয়োগ না ঘটিয়েও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন, চমৎকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্ম দিয়েছেন। অর্থাৎ রিপোর্ট করার প্রক্রিয়াটি সাংবাদিকের নিজস্ব, তাকে তার পেশাগত প্রক্রিয়ার মধ্যেই কাজ করে যেতে হয়। মনে রাখা দরকার, একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর নিরপেক্ষতা বা অনিরপেক্ষতাকে ছাপিয়ে রিপোর্টকে বিচার করা হয় তার যথার্থতা, শুদ্ধতা বা নির্ভুলতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার (Accuracy & Objectivity) মানদণ্ডে। তথ্য অধিকার আইন সে সুযোগ এনে দিয়েছে কি না তাই বিবেচনা করতে হবে।

কোনো প্রতিবেদন তৈরিতে নিজস্ব সীমারেখা টানা বা সেল্‌ফ সেন্সরশিপ (Self censorship) সাংবাদিকদের মধ্যে বহুল আলোচিত বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একজন ব্যক্তি সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন, পরে আর সেই উদ্দেশ্য তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। জনস্বার্থে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা সাংবাদিকদের প্রধান দায়িত্ব হলেও নানা টানাপোড়েনে অনেকেই সেই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে সরে দাঁড়ান। নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বা নিরাপত্তার স্বার্থেও অনেকে তথ্যক্ষেত্রে ঢুকতে চান না। আবার তথ্যক্ষেত্রে ঢুকলেও সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করেন না। তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কেননা এই আইন সাংবাদিকের সামনে আরো বিপুল তথ্যের সমাবেশ ঘটাবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে তথ্য আহরণে, সংবাদ-তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের সাহায্য করবে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সেই আহরিত সংবাদ-তথ্য সাংবাদিক তাঁর প্রতিবেদনে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগালেই তা উৎকৃষ্ট অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে—বিষয়টি তেমন নয়। ঐ আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে আরো কোনো সংবাদ তৈরি হচ্ছে কি না—সে ব্যাপারে সজাগ থাকার বিষয়টি ভুলে যাওয়া যাবে না। সাংবাদিকরা প্রথাগতভাবে যেভাবে কাজ করেন সেভাবেই আহরিত সংবাদ-তথ্যকে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে তাকে যথাস্থানে কাজে লাগিয়ে প্রতিবেদনের স্বীকৃত কাঠামোর মধ্যে স্থান দেবেন, তাকে সেভাবে সাজাবেন। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন যেন কোনোভাবেই সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, তার নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও স্বীকৃত কাজের ধারাকে দুর্বল করে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলেই সাংবাদিকতা ও তথ্য অধিকার আইন পরস্পরকে প্রয়োগ ও ব্যবহারে সমৃদ্ধ করবে।

সাংবাদিকদের জন্য লক্ষণীয়

তথ্য অধিকার আইন সংবাদকর্মীদের জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই প্রয়োজন পড়বে। আগেই বলা হয়েছে, দিনের রিপোর্ট করার জন্য এ আইনের আশ্রয় নিয়ে কাজ করার খুব সুযোগ নেই। তবে অনুসন্ধানী বা ইনডেপথ রিপোর্ট, উন্নয়নমূলক বা গবেষণাধর্মী রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে আইনটির সহযোগিতা নিতে পারেন সংবাদকর্মীরা। যখন কেউ তথ্য দিতে অপারগতা জানাবে তখনই তাকে এই আইনের কথা স্মরণ করে দেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য দিতে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জও করা যাবে। এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। গোপন বলে তথ্য প্রচার না করার প্রচলিত ধারণাকে ভাঙা যাবে।

এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করা গেলে সাংবাদিকরা সব সময়ই সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য পাবেন। কোনো বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সরকারি বক্তব্যও পাওয়া যাবে। তথ্যে কোনো গরমিল আছে কি না তা স্পষ্ট হবে। সাংবাদিকের কাছে তার প্রমাণ থাকবে। রিপোর্টের ভিত্তি মজবুত হবে।

এজন্য কোন পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রিপোর্ট করবেন, সে ক্ষেত্রে সচেতন থাকা জরুরি। যেমন :

ক) যখন কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে চাইবে না।

খ) তথ্য-প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

গ) সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত রিপোর্ট করার জন্য এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিজের কাছে রাখতে।

ঘ) কোনো সরকারি কর্মকর্তা তথ্য দিতে সর্বতোভাবে বাধা দিলে সে ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতে।

ঙ) দুর্নীতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের তথ্য হাতের কাছে রাখতে।

চ) যেসব তথ্য স্বাভাবিক উপায়ে সাংবাদিকরা পান না সে ক্ষেত্রে ।

তথ্য পেতে জানতে হবে

১. কার কাছে তথ্য চাইতে হবে

২. তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কারা

৩. তথ্য কীভাবে চাইতে হবে

৪. কোন কোন সংস্থা তথ্য দেবে

৫. তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া কী

৬. যেসব তথ্য চাওয়া যাবে না

৭. তথ্য না পেলে কী করতে হবে

৮. তথ্য না দিলে কী ব্যবস্থা

৯. হয়রানি করলে কোথায় অভিযোগ

১০. আইন না মানলে কী শাস্তি

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ৩ থেকে ৭ দিন—১৫ দিন বা এক মাস—দুই মাস বা আরো বেশি সময় নিয়ে

যেকোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য পেতে তথ্য অধিকার আইন সহায়ক। এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হতে পারে :

১. সরকারি-বেসরকারি কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির ওপর।

২. সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রকল্পের ওপর।

৩. সরকারি-বেসরকারি নিরীক্ষা বা অডিট প্রতিবেদনের ওপর।

৪. সরকারি-বেসরকারি কোনো বড় সিদ্ধান্ত, নীতিমালার ওপর।

৫. সরকারি-বেসরকারি কোনো ক্রয় কার্যক্রমের ওপর।

৬. জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নের ওপর।

৭. প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর।

৮. সরকারি গোপনীয় কার্যক্রমের ওপর।

৯. বৈদেশিক সম্পর্ক ও আন্তদেশীয় চুক্তির ওপর।

এরকম বিশেষ প্রতিবেদন বা বিশেষায়িত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চটজলদি তথ্য পাওয়া যায় না বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহজে তথ্য দিতে আগ্রহী হয় না। সে ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চাইতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশাসন বা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা তৈরি হলে দেখা যাবে, সংশ্লিষ্টরা চাহিবামাত্র খুব কম সময়ে তথ্য সাংবাদিকদের দিয়ে দেবেন। সেটি না ঘটলে সাংবাদিকদের উচিত, আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক লিখিতভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করা। এ ক্ষেত্রে তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত সাংবাদিকদের লেগে থাকা জরুরি এবং এজন্য তথ্য কমিশন পর্যন্ত বিষয়টির ফয়সালা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে এই সময়ের মধ্যে সাংবাদিক যে বিষয়ে রিপোর্ট করতে চাইছেন এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে ধরনা দিচ্ছেন, সে বিষয়ে রিপোর্ট করে চাপ সৃষ্টিও করা যেতে পারে, যা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কেই সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

প্রায়োগিক ক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকদের সুবিধা

বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ তথা সর্বস্তরের জনগণ তাদের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিলে সার্বিকভাবে জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। সরকারি-বেসরকারি কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে, সুশাসন ও ন্যায়বিচারের ধারা জোরদার হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের দেহে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে সমুজ্জ্বল করতে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ তাই সবার কাম্য। এজন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের

আশ্রয় মানুষ কীভাবে নিচ্ছে তাও হতে পারে সাংবাদিকদের সংবাদ-উপকরণ।

১. কারা, কেন, কী তথ্য চেয়ে আবেদন করছে তা সাংবাদিকদের জানা উচিত।

২. তথ্য চাইতে গিয়ে কোনো ঘটনা ঘটছে কি না সেদিকে নজর দেয়া।

৩. তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আইন মানছে কি না তা মনিটর করা।

৪. তথ্য না পেয়ে কারা, কেন, কীভাবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করছেন তা জানা।

৫. বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে 'র‍্যাপোর্ট বিল্ডিং'।

৬. তথ্য কমিশন থেকে সংবাদ-উপকরণ আহরণে সচেষ্ট হওয়া।

সাংবাদিকের তথ্যপ্রাপ্তি

সাংবাদিকতা পেশার মূল ভিত্তি হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। একজন সাংবাদিক সমাজের অগ্রসর মানুষ হিসেবে জনস্বার্থে রাষ্ট্র ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তা জনগণের উদ্দেশে প্রকাশ করবেন। এ ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর ১১(২)(বি)(সি) ধারায় বর্ণিত সাংবাদিকদের আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে, এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। এছাড়া প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৩(২) ধারা অনুযায়ী সাংবাদিককে তার সূত্র প্রকাশে বাধ্য না করারও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি অধিকারের চেয়েও, বেশি গুরুত্ববহ। কাজেই সাংবাদিকদের সঙ্গে তথ্যসূত্রগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যসূত্রসমূহ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা, অসহযোগিতা মেলে তা বিবেচনায় আনতে হবে। তাহলেই সংবাদ-তথ্যের বিস্তৃত জগতে প্রবেশাধিকার ঘটবে। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ায় কিছু বিশেষ ক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার বিস্তৃত সুযোগ ঘটবে। যেমন :

দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রম

উন্নয়ন-দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাতে সরকার সম্পর্কে, সরকারের দায়িত্ব, নাগরিক হিসেবে জনগণের অধিকার, সরকারি সেবা ও সুবিধা পাওয়ার দিকগুলোর ব্যাপারে মানুষ সব সময়ই জানতে চায়। জনগণের উন্নয়নের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া, নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম, সেবা খাতে তাদের কাজ, এলাকায় সম্পদ বরাদ্দের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া বা তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হলেই এ ব্যাপারে সব জানা যাবে। জনগণের নিরাপত্তা, অধিকার আদায় ও সুরক্ষার জন্য প্রণীত এই আইন তাই এ বিষয়ে সংবাদ আহরণের সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দেবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ

সুশাসনের অন্যতম প্রথম শর্ত হচ্ছে জবাবদিহি। সেজন্য সরকার, প্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম-সংক্রান্ত তথ্য নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু সরকারি গোপনীয়তার নামে সরকারের এই কাজের ধারার তথ্য প্রকাশ করা হয় না, যে জন্য দুর্নীতি বেড়ে যায়। নাগরিকের কাছ থেকে কর আদায় করে কী কী সেবা দেওয়া হচ্ছে, সরকার পরিচালনায় সেই অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে তাও জানার সুযোগ থাকে না। একইভাবে সরকারি বা বিদেশি অর্থে পরিচালিত বেসরকারি সংগঠনের কাজ প্রকৃত অর্থে জনগণের কল্যাণে হচ্ছে কি না, না দুর্নীতির কারণে জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে—এসব জানার দিকেও এই আইন সাংবাদিকদের মনোযোগ বাড়িয়ে দেবে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-কাজে জড়িত সেই সব তথ্যই কেবল জনগণ জানতে পারবে যেগুলো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা-কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত। দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত তথ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। এ ছাড়াও যেসব তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এ রকম তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে কোনো অনুরোধ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইনের বিধানগুলো বিবেচনায় রেখেই সাংবাদিককে এগিয়ে যেতে হবে।

ব্যক্তিখাতের কার্যক্রম

এই আইনে ভোক্তা অধিকার থেকে শুরু করে ব্যক্তিখাতের অনিয়মের তথ্য সরাসরি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু কোনো নাগরিক ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানতে চাইলে, তা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা চুক্তিকারী সংস্থার কাছ থেকে পেতে পারেন। এ ছাড়া কোনো নাগরিক সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো তথ্য চাইলে, সে তথ্য তাদের কাছে না থাকলে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে তারা কত দিনের মধ্যে তথ্য দিতে বাধ্য, সে সম্পর্কে আইনে কিছু বলা নেই। এ ক্ষেত্রে তথ্য আদায়ে সময়কেও হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। সাংবাদিককে এই সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেই অনুসন্ধানী হতে হবে।

সরকারি কাজকর্ম

সরকারি কর্মকাণ্ডের সংবাদ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। বাস্তব অর্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নানা কাজের খবরাখবর, সরকার কীভাবে কাজ করে ও সিদ্ধান্ত নেয়, কিসের ভিত্তিতে ও কোন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়, সেসব তথ্য সাধারণত জনগণ জানতে পারে না। বড় বড় সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের খবর সাংবাদিককে নিজে উৎসাহী হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সংগ্রহ করতে হয়। তাই তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সঙ্গে সাংবাদিকদের সুসম্পর্ক থাকবে, কিন্তু সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিককে প্রভাবিত না হয়ে কৌশলী হতে হবে।

সাংবাদিকদের সুযোগ ও প্রয়োগ

সাংবাদিকরা মূলত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও নানা রকম দুর্নীতি তুলে ধরতে চান। সামাজিক দায়বদ্ধতা, সব ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটা কমিটমেন্ট কাজ করে সাংবাদিকদের মধ্যে। তথ্য অধিকার আইন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ শুরু হলে মাঠপর্যায়ে এই কমিটমেন্ট নিয়ে সাংবাদিকদের কাজ করার সুযোগ বাড়বে।

সাংবাদিকরা কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। তবে সব ক্ষেত্রেই ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিয়ে তথ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রকৃতি বিচিত্রমুখী। তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেমন সহযোগিতা করেন, কোনো রকম অসহযোগিতা করেন কি না, বা প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগছে কি না, চাহিদামাফিক তথ্য মিলছে কি না, পেলে কী ধরনের তথ্য, না পেলে কেন পান না, সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট হওয়া যাচ্ছে কি না , কোনো রকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে কি না—এসব বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

বিবেচনা করা উচিত : ক. তথ্যসূত্রের গোপনীয়তা। খ. তথ্য যাচাই-বাছাই । গ. তথ্য চেক-ক্রস চেক করা। ঘ. সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছা ও প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আলাপ করা।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তথ্য অধিকার আইন ধারা ৭ অনুযায়ী সরকারের কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক না হওয়ার বিধান সত্ত্বেও ধারা ৯(৯) তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাংবাদিকদের ৯(৯) ধারা ব্যবহার করে বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য আইনগতভাবে সংগ্রহ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

আইনের সহজপাঠ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সংজ্ঞা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(ক) অনুচ্ছেদ বলা আছে—রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সরকারের কাছে যে তথ্য আছে সেটার মালিকও জনগণ। অর্থাৎ ঐ তথ্য শুধু সরকারের একার সম্পত্তি নয়। সরকার তার কাজকর্মের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করে বা তৈরি করে সেই তথ্য জানার অধিকার জনগণের। কারণ জনগণের সম্পদ কাজে লাগিয়ে, জনগণের উন্নতি বা মঙ্গলের জন্যই সরকার কাজ করে। আর এই ধারণা থেকেই এসেছে তথ্য জানার অধিকার।

তথ্য অধিকার কী

যেসব তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যার অভাবে এই অধিকারগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিক নিরবচ্ছিন্নভাবে বা বাধাহীনভাবে অংশ নিতে পারে না, সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলে।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকার, সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর কাছ থেকে তাদের কাজ বা লেনদেন-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য চাইতে পারবে। যা আগে তারা জনগণকে দিতে বাধ্য ছিল না এবং জনগণকে জানতে দিতে চাইত না। যেমন—ঢাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খুব সহজেই ওয়ার্ড কমিশনারের কাছে জানতে চাইতে পারবে, তাদের এলাকার রাস্তা মেরামতের জন্য সরকার থেকে কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে? ওয়ার্ড কমিশনারও এই তথ্য দিতে বাধ্য থাকবেন। আবার অন্যদিকে একজন সাধারণ মানুষ অথবা সংবাদকর্মী আইলা-দুর্গত এলাকায় কর্মরত কোনো এনজিওর কাছে জানতে চাইতে পারবেন দুর্যোগ মোকাবিলায় কত বরাদ্দ পেয়েছে এনজিওটি সরকারের অথবা বিদেশি দাতা সংস্থার কাছ থেকে।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ সেসব তথ্য জনগণের জানার অধিকারের মধ্যে আনা হয়েছে, যেসব তথ্য কর্তৃপক্ষ আগে গোপন রাখত। এই আইনের অধীনে এখন তা দিতে সরকার ও বেসরকারি সংস্থা বাধ্য।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য কী

তথ্য অধিকার আইনের ২(চ) ধারায় তথ্য অর্থ কোনো সরকারি এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থার গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প, প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, আঁকা ছবি, ফিল্ম, ইলেকট্রিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলপত্র সবই বোঝায়।

তবে লক্ষ রাখতে হবে—

- দাপ্তরিক নোট শিট বা নোট শিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- এই আইনের অধীনে 'তথ্য' হচ্ছে সরকারের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অপ্রকাশিত সব তথ্য। সাধারণত 'তথ্য' বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। যেমন, একটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কতজন চিকিৎসক আছেন, কতজনের থাকা উচিত এবং চিকিৎসক কেন ডিউটি থেকে অনুপস্থিত আছেন—এ সবকিছুর তথ্য জানার অধিকার জনগণের আছে। অন্যদিকে আগামী মাসেই শুরু হতে যাচ্ছে ত্রিদেশীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এটাও তথ্য কিন্তু সাধারণ তথ্য।

তথ্য সংরক্ষণ

তথ্য অধিকার আইনের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের যাবতীয় তথ্য এমনভাবে গুছিয়ে রাখবে, যাতে কেউ চাওয়ামাত্র তা দিয়ে দিতে পারেন। সব তথ্যের একটি ইনডেক্স বা ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আর যেসব

তথ্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করবে, সেটাও আলাদাভাবে ক্যাটালগ করে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

তথ্য কমিশন বলে দেবে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোন নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং সব কর্তৃপক্ষকে তা অনুসরণ করতে হবে।

তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের (সরকারি ও বেসরকারি) দায়িত্ব হচ্ছে আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা। প্রতিটি কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে সহজে, কম দামে সম্ভব হলে বিনা মূল্যে গ্রহীতাকে তথ্য দেয়া।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ৭ ধরনের তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ‘কর্তৃপক্ষ’ হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ। আইন অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ এক-একটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট। তবে প্রয়োজন হলে একটি প্রতিষ্ঠানের একের বেশি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট থাকতে পারে। কমপক্ষে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা থাকবেন। তিনি স্থায়ীও হতে পারেন অথবা অন্য কাজের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্তও হতে পারেন।

ইউনিয়ন পরিষদও কর্তৃপক্ষ

এখানে উল্লেখ্য যে তথ্য প্রদান ইউনিট উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও ইউনিয়ন পরিষদও তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আইনের প্রারম্ভিক সংজ্ঞা ২(খ)-তে বলা হয়েছে, ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা, কাজেই সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠানটির প্রধানের কার্যালয় হিসেবে এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য প্রদানকারী ইউনিটও বটে।

আইনে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষসমূহ এবং উদাহরণ

কর্তৃপক্ষ ধারা ২(খ)	উদাহরণ
১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা	জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সুপ্রিম কোর্ট এবং পিএসসি
২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীনে গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়	সব মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩. কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীনে গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন
৪. সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ
৫. বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	টিআইবি, ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
৬. সরকারের পক্ষে অথবা সরকার ও সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন সেতুর টোল আদায়কারী সংস্থা, বড় সেতু মেইনটেনেন্স করার সংস্থা, রেলওয়ের বিভিন্ন সার্ভিস পরিচালনাকারী সংস্থা
৭. সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	

আপিল কর্তৃপক্ষ

আইনের ২(ক) ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান। তথ্য চাহিদাকারী ব্যক্তি তার অনুরোধকৃত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন।

তথ্য প্রকাশ

তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাদের সব ধরনের তথ্য অর্থাৎ তারা কী কাজ করেছে, কত টাকা এর জন্য বরাদ্দ রয়েছে বা কবেই বা কাজটি শেষ হবে সেই তথ্য প্রকাশ করবে। এ ছাড়াও কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো অথবা ভবিষ্যতে কী কী কাজ হাতে নিতে যাচ্ছে—এ-সংক্রান্ত সব তথ্য কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করবে।

তথ্য অধিকার আইনের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষ বিদেশি সাহায্য ও সরকারি টাকায় পরিচালিত এনজিও কিছু তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ এসব তথ্য গোপন করা যাবে না এবং জনগণের সামনে তা যথাযথভাবে প্রকাশও করতে হবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর কিছু তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে।

নাগরিকের যেসব তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে বা যেসব তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ বা প্রচারে কর্তৃপক্ষ বাধ্য—

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য—

  উদাহরণ : যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্টের ফি দেড় গুণ বাড়িয়েছে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। কেন তারা এই ফি বাড়াল? এতে জনগণের কী লাভ হবে? ফরম কীভাবে পাওয়া যাবে? পাসপোর্ট তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ এ সবকিছুর উত্তর দিতে বাধ্য।

- প্রকাশিত প্রতিবেদন—প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। যেমন, একটি মন্ত্রণালয় বা এনজিওর বার্ষিক প্রতিবেদন বা Annual Report সেখানে থাকবে—

  - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যক্রম
  - কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব
  - সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ
  - প্রতিষ্ঠানের সব নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, ম্যানুয়াল, তালিকাসহ রক্ষিত তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস
  - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি পাওয়ার শর্তসমূহ ও শর্তের কারণে কোনো ধরনের লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে শর্তগুলোর বিবরণ।

উদাহরণ : সরকার প্রত্যেক সংসদ সদস্যের জন্য যে ১৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করেছে, সেই টাকা কোন কোন খাতে, কত সময়ের মধ্যে ব্যয় হবে, কতজন সুবিধাভোগী হবে ইত্যাদি সবকিছু প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য।

অথবা

সরকারের নৌ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নদীবিষয়ক টাস্কফোর্স কেন আবার ঢাকা ও এর আশপাশের নদী থেকে বালু উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছে, সেটারও বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে—এতে কোনো অসুবিধা হবে কি না, লাভ পাবে কতজন।

- নাগরিকের কাছে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকাশ করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পরিচয় এবং বিস্তারিত ঠিকানা।

- কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এসব নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে ঐসব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।

উদাহরণ : সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক ধরনের মতামত থাকতে পারে। সরকারকে জানাতে হবে, কেন এই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল? এতে দেশের কী লাভ হবে।

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের কাছে উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে—

উদাহরণ : বার্ষিক প্রতিবেদন, তদন্ত রিপোর্ট, গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন, যেকোনো ধরনের বই বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে দিতে হবে।

- কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্ব ও জটিল বিষয়গুলো প্রেস বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোনো পন্থায় প্রচার ও প্রকাশ করবে।

  উদাহরণ : বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবহার, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দিচ্ছে।

- মন্ত্রিসভায় কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সিদ্ধান্তের কারণ ও ভিত্তি-সম্পর্কিত তথ্য জানাবে। তবে এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের অনুমতি নিতে হবে।

  উদাহরণ : মন্ত্রিপরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো 'ডে লাইট সেভিংস' (ডিএলএস) সময়সূচি আর প্রবর্তন করা হবে না। কেন সরকার এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিল তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

কিছু তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণ সব তথ্য পাওয়ার অধিকার পেলেও ৭ ধারার বিশেষ কিছু তথ্য কর্তৃপক্ষ জনগণকে নাও দিতে পারে বা দিতে বাধ্য নয়। এই ধরনের বিধানকে আইনি ভাষায় 'রেয়াত' বলা হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশের তথ্য অধিকার আইনে এক্সেম্পশন বা রেয়াত-সংক্রান্ত ধারা রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার' ভাগে উল্লিখিত অধিকাংশ অধিকারই 'আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসম্মত বাধা-নিষেধ' সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারাকে সেই আলোকেই দেখতে হবে।

৭ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে বিশেষ কিছু তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না। তথ্য অধিকার আইনে এই ব্যতিক্রম পরিস্থিতি বা তথ্যগুলোর ব্যাপারে ধারা ৭-এর ২০টি উপধারায়, ধারা ২-এর (চ) এবং ধারা ৩২-এ আলোচিত হয়েছে।

অন্যভাবে বলা যায়, উল্লিখিত ২০টি বিষয় বাদ দিয়ে বাকি সব বিষয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে এই আইন 'কর্তৃপক্ষের' ওপর আইনানুগ দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করেছে।

যেসব তথ্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা নেই

ধারা ৭(ক) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে;***

ব্যাখ্যা : বহিরাক্রমণগত কারণে যেমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হয়, তেমনি কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ সংকটও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হতে পারে।

'সার্বভৌমত্ব' মানে কোনো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। রাষ্ট্রে অন্য সকলের ওপর আইন আরোপ করার কিংবা বিদ্যমান আইন পরিবর্তন করার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব যার রয়েছে—যেকোনো রাষ্ট্রে সেই প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংস্থার ওপর সার্বভৌমত্ব বর্তায়। বাংলাদেশে সংবিধানই হলো সার্বভৌম।

উদাহরণ : কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিডিআর-এর শক্তি কতটা বাড়ানো হয়েছে, তাদের অবকাঠামোগত বা কৌশলগত কোনো তথ্য। আবার ধরে নেয়া যায়, যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে বা অন্য কোনো ইস্যুতে বা সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের ভিত্তিতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো বিশেষ দূতাবাসের সঙ্গে সরকার কী আচরণ করেছে, নজরদারি বাড়ানো হয়েছে কি না, এ-সংক্রান্ত কোনো তথ্য। সেনাবাহিনী কী পদ্ধতিতে তাদের যুদ্ধকৌশল ঠিক করে ইত্যাদি।

ধরা যাক, দুটি দেশ সমরাস্ত্র আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত একটি চুক্তি করল। সেই চুক্তি প্রকাশে তারা বাধ্য নয়। কারণ এর ফলে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তিকারী দুটি দেশের সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর তথ্য উন্মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে এই নিয়ম চালু আছে।

ধারা ৭(খ) : ***পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;***

উদাহরণ :

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন—জাতিসংঘ, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিস (ওআইসি)-এর মধ্যে যেসব ভোটাভুটি হয়, সেখানে আমাদের রাষ্ট্র কাকে ভোট দিল, সেটা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই।
- তবে আঞ্চলিক কোনো জোট যদি কোনো চুক্তি করে যা গোপনীয় নয়, বরং সবার জন্য প্রযোজ্য, তাহলে তা প্রকাশ করা বা সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া যেতে পারে। যেমন, জলবায়ু সম্মেলনে সম্পাদিত কোনো চুক্তি।

ধারা ৭(গ) : ***কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত গোপনীয় কোন তথ্য;***

ব্যাখ্যা : বিদেশি সরকার অনেক সময় কূটনৈতিক নোট বা রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এসব তথ্যেও গোপনীয়তা রক্ষা করা অনেক সময় সর্বোচ্চ কূটনৈতিক বিশ্বাস বলে গণ্য হতে পারে।

উদাহরণ : বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ কোনো জঙ্গি সংগঠন গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে—এ মর্মে অন্য কোনো দেশ সরকারকে তথ্য দিলে, সেটা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই।

ধারা ৭(ঘ) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;***

ব্যাখ্যা : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী 'তৃতীয় পক্ষ' বলতে যা বোঝায়, এখানে তা বোঝাবে না। এখানে 'তৃতীয় পক্ষ' হলো যে ব্যক্তি কোনো মামলা, চুক্তি বা অন্য কোনো লেনদেনের পক্ষ নয়, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে লেনদেনটির সঙ্গে জড়িত।

কপিরাইট স্বত্ব হলো—সাহিত্য, নাটক, শিল্পকর্ম, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র এবং শিল্পসুলভ অন্য কোনো কাজ। কপিরাইট আইন ২০০০-এর ১৪ ধারায় বিশদভাবে বলা আছে কপিরাইটের অর্থ কী। আইনে বলা আছে, প্রণেতার জীবদ্দশায় প্রকাশিত কোনো সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত বা শিল্পকর্ম তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আইনের ৭৬ ধারায় বলা আছে, কপিরাইট লঙ্ঘন করলে কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণ, হিসাব এবং আইনে প্রদত্ত অন্যান্য প্রতিকার পাবেন। আইনের ৮২ ধারায় বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে কপিরাইট লঙ্ঘনকারী অন্যূন ছয় মাস থেকে অনূর্ধ্ব চার বছরের কারাদণ্ডসহ

জরিমানায় (অর্থদণ্ডে) দণ্ডিত হবেন। উল্লেখ্য যে, কপিরাইট আইনে পাবলিক ডোমেইন, সার্বলৌকিক এলাকা, যেমন—১. সরকারি খাসজমি, ২. প্রকাশনা, উদ্ভাবনা ও প্রক্রিয়ার সেই ভুবন কপিরাইট বা পেটেন্টের আইন দ্বারা সংরক্ষিত নয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি—মনুষ্যমেধা-সঞ্জাত বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবোধ উৎপন্নসামগ্রীর সুরক্ষার জন্য একশ্রেণীর স্পর্শগম্য অধিকার। ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ও কৃতস্বত্বের অধিকার, বাণিজ্যিক গুপ্ত পদ্ধতিসংক্রান্ত অধিকার, প্রচারণা, নৈতিক ও অন্যায় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ :

- কোনো একটি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের ফর্মুলা প্রকাশ নাও করতে পারে। যেমন, ক্যানটাকি ফ্রাইড চিকেন বা কেএফসি'র তৈরি খাদ্যের রেসিপি তাদের নিজেদের ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি, এটা তারা প্রকাশ করবে না, কারণ অনেকেই তা জেনে যেতে পারে। তখন তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে তাদের তৈরি খাদ্যে কী কী উপাদান আছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ক্রেতার জানার জন্য।

ধারা ৭(ঙ) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, এরূপ নিম্নোক্ত কোন তথ্য, যথা —***

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা ব্যবহার করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় বা সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা বা তদারকিসংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

উদাহরণ :

- যেমন বাজেট হওয়ার আগেই কোন কোন জিনিসের দাম বাড়তে পারে বা সরকার কোন পণ্যের ওপর শুল্ক নির্ধারণ করতে যাচ্ছে তা প্রকাশ পেলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং পণ্যের দাম অস্থিতিশীল হতে পারে।

- বাজারে শেয়ার আসার আগেই আগাম মূল্য প্রকাশিত হলে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।

ধারা ৭(চ) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এরূপ তথ্য;***

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে আইনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, আইন অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশের আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো প্রথা বা রীতি।

প্রথাগত আইন : যে লৌকিক রীতিনীতি সমাজে কোনো অবশ্যপালনীয় আচরণবিধি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে বা এর ব্যবহার একটি সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এতটাই গভীরভাবে মিশে গেছে যে ঐগুলোকেও প্রচলিত আইন বলে গণ্য করা হয়।

উদাহরণ :

- পুলিশের বিশেষ অভিযান কখন কোথায় চলবে—এ তথ্য প্রকাশিত হলে অপরাধীরা গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ পাবে। অভিযান ব্যর্থ হবে।
- ভেজালবিরোধী অভিযান কবে, কখন, কোন এলাকায় বা কোন দোকানে বা হোটেলে চলবে—তা আগে প্রকাশিত হলে অপরাধীরা সাবধান হয়ে পড়বে।

ধারা ৭(ছ) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য***

উদাহরণ :

- সরকার কোনো সন্ত্রাসীর গোপন আস্তানার খবর পেল। সেই তথ্য অনুযায়ী আইনরক্ষাকারী বাহিনী সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। এই তথ্য আগে প্রকাশিত হলে সেই এলাকার জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।
- আবার বিচার চলছে এমন ইস্যুর ক্ষেত্রে এমন কোনো তথ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়, যা বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

ধারা ৭(জ) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;***

ব্যাখ্যা : আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কে।

ব্যক্তি : কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং ক্ষেত্রমত, সংবিধিবদ্ধ হোক বা না হোক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। দণ্ডবিধির ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তি বলতে সমিতিভুক্ত হোক বা না হোক, যেকোনো কোম্পানি বা সমিতি বা ব্যক্তি-সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্যক্তি যেমন একটি মানুষ হতে পারেন, তেমনি নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিও ব্যক্তি হতে পারে—(১) সমিতিভুক্ত কোম্পানি; (২) ডিপজিটরি কারবার (মূল্য-সংযোজন কর আইন-অনুসারে, ব্যক্তি বলতে কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, সংঘ ও সমিতি ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে), সমিতিভুক্ত নয় এমন কোম্পানি; (৩) সমিতি; (৪) প্রতিষ্ঠান; (৫) গর্ভস্থ শিশু।

তবে ব্যক্তি যদি পাবলিক ফিগার বা জনব্যক্তিত্ব হন, তাহলে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে। যেমন, খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করে যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয় হয়েছেন, এমন ব্যক্তি মানহানির মামলা করলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, বিবাদী বিদ্বেষমূলকভাবে কার্য করেছেন।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার প্রথম ব্যতিক্রম অনুসারে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য দোষারোপ করা মানহানিকর বলে গণ্য হবে না, যদি উক্ত দোষারোপ জনকল্যাণের উদ্দেশে প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হয়।

প্রাইভেট ল ও প্রাইভেসি কথাটি সমার্থক। প্রাইভেসি অর্থ একান্ততা বা বিনিক্ততা। এর দ্বারা কারো একা থাকার অধিকার বোঝায়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩(খ) অনুচ্ছেদ-অনুসারে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য

উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে। দেশের যাবতীয় দলিলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি দলিল ও ব্যক্তিগত দলিল।

সংসদ সদস্যদের মতো ব্যক্তিরও কতিপয় বিশেষ অধিকার রয়েছে। নাগরিক হিসেবে কিছু সাধারণ দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়াকে বিশেষাধিকার বলে। বিশেষাধিকারসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : জনস্বার্থের বিশেষাধিকার ও প্রতিজনিক বিশেষাধিকার। রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করতে রাষ্ট্রের বিশেষ অধিকার রয়েছে।

একান্ত তথ্যজ্ঞাপন (কনফিডেন্সিয়াল কমিউনিকেশন) : বিশ্বাসপূর্বক একজন মক্কেল তার আইনজীবীর কাছে বা একজন রোগী তার চিকিৎসকের কাছে যদি তার মামলা বা রোগসংক্রান্ত কোনো তথ্য জ্ঞাপন করেন, সে ক্ষেত্রে ওই আইনজীবী বা চিকিৎসক তা সংরক্ষণ করার অধিকারী। সাক্ষ্য আইনের ১২১—১২৯ ধারায় বিচারক, স্বামী-স্ত্রী, সরকারি কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-কর্মকর্তা, আইনজীবী প্রমুখের কাছে প্রদত্ত বার্তার বা দলিলের গোপনীয়তা কোন অবস্থায় রক্ষা করতে পারেন, তা বলা হয়েছে।

উদাহরণ : 'এইডস' আমাদের দেশে এখনো একটি স্পর্শকাতর রোগের নাম। কোনো রোগী যদি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের কাছে যায় এবং সবকিছু প্রকাশ করে, তখন তা সবার সামনে প্রকাশের বিষয় নয়। তবে, এর ফলে যদি পরিবার ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে সেই বিষয়টিকে গোপন করা যাবে না।

ধার ৭(ঝ) : ***কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এরূপ তথ্য;***

ব্যাখ্যা :

জীবনের অধিকার : কোনো ব্যক্তির জীবনরক্ষার অধিকার একটি স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার জাতিসংঘের মানবাধিকার-ঘোষণাপত্রে এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত। বহু দেশে এই অধিকারের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের অধিকার রহিত করা হয়েছে।

দণ্ডবিধির ৪৫ ধারায় বলা হয়েছে, প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হলে জীবন বলতে মানুষের জীবন বোঝাবে।

উদাহরণ :

- লেখক 'ক' তাঁর বিভিন্নমুখী লেখালেখির কারণে একটি গোষ্ঠীর বিক্ষোভের মুখে নিরাপত্তার কারণে দেশত্যাগের পর বর্তমানে ভারতের কোথাও আছেন। কিন্তু তিনি ঠিক কোথায় অবস্থান করছেন—এ তথ্য প্রকাশিত হলে তাঁর জীবনের ওপর হামলা হতে পারে। কারণ সেখানেও তিনি মৌলবাদীদের হুমকি মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছেন।
- অনেক সময় রাষ্ট্রনায়কদের নিরাপত্তা জোরদার করতে তাঁদের সফরসূচি, যানবহনের অবস্থান প্রভৃতি তথ্য প্রকাশ করা হয় না।

ধারা ৭(ঞ) : ***আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;***

উদাহরণ :

- কেউ যদি পুলিশকে সহায়তা করার জন্য অপরাধীদের খোঁজ দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। পরিচয় প্রকাশ করা হলে সোর্সের জীবন হুমকির মুখে পড়বে।
- অফিসে চলমান কোনো দুর্নীতির বিষয়ে কেউ যদি পুলিশকে অথবা সংবাদকর্মীকে কোনো তথ্য দেয়, সেই ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করা হলে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

ধারা ৭(ট) : ***আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;***

ব্যাখ্যা :

বিচারাধীন মোকদ্দমা-ঘটিত বিধি : যে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী স্পিকার প্রশ্নোত্তর বা বিতর্ককালে আদালতের বিচারাধীন বিষয়াদির (দেওয়ানি বা ফৌজদারি) উল্লেখ বারণ করেন। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে, তাহার বিধিটি রহিত করার ক্ষমতা রয়েছে, যদি জাতীয় স্বার্থঘটিত কোনো বিষয় তাতে সম্পৃক্ত থাকে।

আদালত অবমাননা : আদালত-অবমাননা আদালতের আদেশ-নির্দেশ এবং আদালতের মর্যাদার অবমাননা। আদালত বা বিচারক সম্পর্কে কটূক্তি বা মর্যাদাহানিকর উক্তি বা লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করলে আদালতের অবমাননা হয়। আদালত চলাকালে বা আদালতের বাইরেও আদালত-অবমাননার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। আদালত-অবমাননা বলতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয়ই হতে পারে।

সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' হবেন এবং এর অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডদানের ক্ষমতাসহ আইনসাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সব ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন। কোর্ট অব রেকর্ড ভিন্ন অন্য কোনো আদালত তার অবমাননার জন্য বিশেষ অবস্থা ভিন্ন কাউকে দণ্ড দিতে পারেন না। সেজন্য আদালত-অবমাননার ঘটনা ঘটলে যেকোনো নিম্ন আদালত তা তদন্ত করে শাস্তি প্রদানের জন্য বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে অবহিত করেন।

উদাহরণ :

অনেক সময় দেখা যায়, কোনো বিশেষ ধরনের মামলার শুনানি চলাকালে আদালত বিশেষভাবে তথ্য গোপন রাখার নির্দেশ দেন অর্থাৎ কোনো তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকলে ঐ মামলার বিষয়ে কিছু জানতে চাওয়া হলে, তা আদালত অবমাননার শামিল হবে।

ধারা ৭(ঠ) : ***তদন্তনাধীন কোন বিষয় যাহার বিষয় তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এরূপ তথ্য;***

উদাহরণ :

কোনো ঘটনার তদন্ত চলাকালে তদন্ত কমিটি কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, বিভিন্নজনের দেয়া বক্তব্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো তথ্য নাগরিককে দেওয়া যাবে না। কেননা, এতে তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে অথবা এর ফলাফলের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। বেশ

কয়েকটি ঘটনার তদন্ত চলাকালে আমরা এরকম দৃষ্টান্ত পেয়েছি। যেমন 'বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড' ঘটনার সময় আমরা দেখেছি তদন্ত কমিটি সব তথ্য প্রকাশ করেনি।

ধারা ৭(ড) : ***কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধী গ্রেপ্তার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ তথ্য;***

উদাহরণ :

- কোনো অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তির নাম, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত কারো নাম, যদি আগেই অর্থাৎ তদন্ত চলাকালে প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে আশঙ্কা থাকে যে অপরাধী গা ঢাকা দিতে পারে। অথবা অন্য কোনো অসাধু পথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করতে পারে।

- আবার দেখা যায় তদন্ত বা বিচারিক কাজ চলাকালে, সে-সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশিত হলে, তা বিচারকের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকেও নিরুৎসাহিত করা হয়।

ধারা ৭(ঢ) : ***আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;***

উদাহরণ :

অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে বলে রাষ্ট্র বা আদালত। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপনীয় তথ্যগুলো সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর আগে এগুলো প্রকাশে বাধ্যবাধকতা আছে। যার ফলে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার সময়ে অর্থাৎ পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্য, নথিপত্র আমরা সেদিন জানতে পেরেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলিলপত্র থেকে।

ধারা ৭(ণ) : ***কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;***

উদাহরণ :

কোনো আবিষ্কার বা গবেষণা-প্রতিবেদন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গোপন রাখতে পারে। যেমন, কোনো কোম্পানি এমন কোনো চুলা আবিষ্কার করল, যা গ্যাস-সাশ্রয়ী। সেটি ক্রেতাদের কাছে ভালো বাজার পেল। সেই চুলার কারিগরি দিকটি অর্থাৎ কী পদ্ধতিতে বানিয়েছে, কী কী উপাদান আছে—এটা প্রকাশিত হলে ঐ কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থের হানি হতে পারে।

ধারা ৭(ত) : ***কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;***

উদাহরণ : ধরা যাক, সরকারি হাসপাতালগুলোতে এক্স-রে মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সরবরাহকারী নির্বাচন করবেন। দরপত্র খোলার আগে কোনো তথ্য প্রকাশিত হলে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নষ্ট হবে। যেকোনো সরকারি-বেসরকারি অফিসের ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই দরপত্রের রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

ধারা ৭(থ) : ***জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এরূপ কোন তথ্য;***

ব্যাখ্যা :

১৯৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বনাম নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, সিলেট ও অন্যান্য মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে বলা যায়, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় কমিটিসমূহ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদ, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট মেম্বারস রিম্যুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজ অ্যাক্ট ১৯৭৩ এবং কার্যপ্রণালি বিধির কয়েকটি বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কার্যপ্রণালি বিধিতে সংসদীয় কমিটিগুলোকে রেকর্ড, কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এ বিধিটি সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে সহজেই গ্রহণযোগ্য হলেও কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে।

স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদের সীমার মধ্যে কাউকে গ্রেপ্তার বা কোনোরূপ দেওয়ানি ও ফৌজদারি পরোয়ানা জারি করা যায় না।

সংসদের, কোনো সংসদীয় কমিটির বা কোনো সদস্যের বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে যেকোনো সংসদ সদস্য প্রশ্ন তুলতে পারেন। এজন্য সংসদের কোনো বৈঠক শুরুর অন্তত দুই ঘণ্টা আগে সচিবের কাছে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে।

দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৫(ক) ধারায় দেওয়ানি পরোয়ানা, আটক এবং গ্রেপ্তার হতে সংসদ সদস্যের অব্যাহতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ানি পরোয়ানাধীনে গ্রেপ্তার করা বা কারাগারে আটক রাখা যাবে না; (ক) কোনো আইনসভার সদস্যকে উক্ত অইনসভার অধিবেশন চলাকালে; (খ) অনুরূপ আইনসভার কোনো সদস্যকে উক্ত কমিটির বৈঠক চলাকালে; এবং অনুরূপ অধিবেশন বা বৈঠকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে।

উদাহরণ :

- সংসদ সদস্যদের বাকস্বাধীনতা হরণ করতে পারে এরূপ কোনো তথ্য

- সপ্তম সংসদ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬(৩) কিংবা ৭৮(৫) অনুচ্ছেদের আওতায় কোনো আইন প্রণীত হয়নি। ৭৬(৩) বলেছে, সংসদ আইনের দ্বারা সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহকে ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের খ) দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

- সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে, ১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। ২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর ওপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে তিনি সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না। ৩) সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না। ৫) এই অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইনের দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাবে।

ধারা ৭(দ) : ***কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;***

উদাহরণ : Income tax return ordinance 1984 *এবং* Bankers book evidence Act, 1891 *দ্বারা ব্যক্তির সংরক্ষিত তথ্য এই ধারার অধীনে গণ্য করা হবে।*

ধারা ৭(ধ) : ***পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;***

উদাহরণ : কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এই পরীক্ষার আগে নাগরিকের হাতে দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়। ঠিক তেমনই নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে জানাতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা ৭(ন) : ***মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টাপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষাঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য;***

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

উদাহরণ : জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় নির্ধারণের জন্য একটি বৈঠক করল। ঐ বৈঠকে সংশ্লিষ্ট অনেক কাগজপত্র, দলিল, পরিসংখ্যান, প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐ বৈঠক থেকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, তাহলে ঐসব তথ্য কর্তৃপক্ষ জনগণকে দিতে বাধ্য থাকবে না। কিন্তু ঐ বৈঠকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে ঐ সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসমূহ এবং এর ব্যাখ্যাও জনগণ জানতে পারবে। যেমন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে—এখন থেকে দুই ঘণ্টা ধরে না চলে ১ ঘণ্টা করে লোডশেডিং চলবে। কেন চলবে এর কারণও সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬-এর রুল-২৪ অনুযায়ী কেবিনেট মিটিং ও রেকর্ড গোপনীয় দলিল হিসেবে ২৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। তারপর ন্যাশনাল আর্কাইভে স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

ধারা ২(চ) : ***দাপ্তরিক নোট সিট বা নোটের প্রতিলিপি তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে না;***

উদাহরণ : দপ্তরের ভেতরে যোগাযোগের জন্য নোট শিট ব্যবহৃত হয়। এতে অনেক সময়ই ব্যক্তিগত আদেশ-নির্দেশ, মতামত থাকে, যা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। যেহেতু একটি দপ্তরের ভেতরে মতামত আদান-প্রদানের জন্য এই নোট শিট ব্যবহৃত হয়, তাই এই তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। তবে এর ওপর ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয় এবং কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে জনগণকে তা জানানো হয়। এই ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন ধরা যাক, পুলিশ বাহিনীতে ৫০০ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কনস্টেবলের নিয়োগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কেন, কী মর্মে, কোন প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নেয়া হলো তা সবই নোট আকারে নোট শিটে লেখা থাকে। কিন্তু এই নোট শিট তথ্য হিসেবে জনগণ পাবে না।

ধারা ৩২ : *সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, যারা তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর অধীনে কোন তথ্য দিতে বাধ্য নয়;*

- জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)
- ডাইরেকটরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ
- ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ
- স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এনএসএফ)
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ
- র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর গোয়েন্দা সেল

তবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য দিতে বাধ্য। যেমন, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউ বা কোনো সেল জড়িত থাকলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোও চাহিদাকৃত তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

যেমন, র‍্যাব বা সিআইডির দপ্তরে কোনো অভিযুক্ত আসামি যদি মারা যায় বা র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার ঘটনা, যাকে মানবাধিকার পরিপন্থী মনে করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে তথ্য দিতে সংস্থা বাধ্য থাকবে। র‍্যাব বা পুলিশের সকল বিভাগ নয়, কেবল উল্লিখিত বিভাগ বা সেলই এই অব্যাহতির আওতাভুক্ত হবে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ভালো দিকসমূহ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ একটি অতি সম্ভাবনাময় আইন। মানুষ যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য খুব সহজে সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন সেজন্যই এরকম একটি আইন প্রণীত হয়েছে। দেখা গেছে, জনগণ প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যা, হয়রানি ও বঞ্চনার শিকার হয় বা হচ্ছে এর অন্যতম বড় একটি কারণ তারা প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানে না বা পাচ্ছে না। যেমন, প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা হয়তো জানেই না যে তাদের জন্য সরকার বিনা মূল্যে বই দেয়। তারা জানে না, কতগুলো বই একটি উপজেলার জন্য বরাদ্দ আছে। স্কুলে বইগুলো হিসাবমতো এসেছে কি না। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এসব তথ্য জানে না বলে তারা দাবিও জানাতে পারে না।

এই আইন কতটা কার্যকর বা কতটা উপকারী তা প্রমাণ করতে হবে জনগণকেই। জনগণ যদি এই আইনের ইতিবাচক দিকগুলোর চর্চা না করে, তবে এটি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ একটি আইনে পরিণত হবে। একে সফল করার দায়িত্ব জনগণের। যথাযথভাবে চাহিদা সৃষ্টি করতে না পারলে তথ্য দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে।

১. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায়

এই আইনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো—বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকারি সহায়তাপুষ্ট ও বিদেশি সাহায্যনির্ভর এনজিওগুলো এই আইনের আওতাভুক্ত। সম্ভবত বাংলাদেশের আইনেই এটা একমাত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি এনজিওর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অনস্বীকার্য। কারণ তারাও জনগণের কল্যাণে অর্থ খরচ করে।

২. প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সুবিধা

কর্তৃপক্ষ যাতে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে এবং প্রতিবন্ধী মানুষ যাতে সহজেই তথ্য পেতে পারে সেজন্য আইনে একটি ধারা রাখা হয়েছে (ধারা ৯-এর ১০)। কোনো ইন্দ্রিয়প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো রেকর্ড বা এর অংশবিশেষ জানানোর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা প্রদান করাও এ সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

৩. তথ্যমূল্য দিতে হবে না

দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তারা যেন বিনা মূল্যে তথ্য পেতে পারে, এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮(৫) অনুযায়ী 'সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে কিংবা কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।'

৪. আদালতে যাওয়ার সুযোগ

কোনো নাগরিক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য না পায়, তবে সে কর্তৃপক্ষের ভিতরকার আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবে। তার পরও নাগরিক যদি আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকে, তবে সে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি কর্তৃপক্ষের কাছে সময়মতো তথ্য না পায়, তবে সে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সব সিদ্ধান্তের বিষয় ও 'সময়'-সংক্রান্ত সবকিছুর জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আর কর্তৃপক্ষ যদি নাগরিককে ভুল তথ্য বা অর্ধসত্য তথ্য দেয়, তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনের কাছে যেতে হবে। তথ্য কমিশনের মূল কাজ হলো বিচারিক এবং আপিল কর্তৃপক্ষের মূল কাজ প্রশাসনিক।

তথ্য কমিশনের বিচার বা জবাবে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি খুশি না হয় তবে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে উচ্চ আদালতে রিট করে প্রতিকার চাইতে পারে।

৫. তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতির প্রসঙ্গ

আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আইনে ২০টি অব্যাহতি রয়েছে অর্থাৎ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এই ২০টি অব্যাহতি তথ্য অধিকারকে সংকুচিত করলেও ধারা ৭ (ন)তে বলা হয়েছে, 'তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।'

'আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।'

অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত যদি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ না করতে চায়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। ধারা ৭ এর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর দুর্বল দিকগুলো

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একটি আইনি ভিত্তি। মানুষ এখন খুব সহজেই এই আইন প্রয়োগ করে তথ্য চাইতে পারবে। আর অন্যদিকে যিনি তথ্য দেবেন, তিনিও কোনো ভয়ভীতি ছাড়া একটি আইনকে কাজে লাগিয়ে তথ্য দিতে পারবেন। তবে এই আইনের ভালো দিক যেমন আছে কিছু দুর্বল দিকও আছে। যেমন—

(১) তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বের অস্পষ্টতা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ যদিও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা হয়েছে, কিন্তু সেটা শুধু সরকারি ও বিদেশি অর্থে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাগুলো। ভোক্তা অধিকার থেকে শুরু করে ব্যক্তিখাতের দুর্নীতির তথ্য সরাসরি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এই আইনে।

তবে ব্যক্তিখাতকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সংস্থা তার মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এখানে সেই ব্যক্তিখাত তৃতীয় পক্ষের ভূমিকায় চলে যাবে। কোনো নাগরিক সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইলে সেই তথ্য তার কাছে না থাকলে, তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নাগরিককে জানাতে পারবে। আবেদনের কত দিনের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য চাইতে হবে, সেটা স্পষ্টভাবে আইনে বলা আছে। কিন্তু এটা বলা নাই যে তৃতীয় পক্ষ কত দিনের মধ্যে উত্তর দেবে বা দিতে বাধ্য থাকবে।

এর ফলে সমস্যায় পড়বে দ্বিতীয় পক্ষ এবং নাগরিক, যিনি তথ্যটি জানতে চেয়েছেন। কারণ দ্বিতীয় পক্ষকে কতদিনের মধ্যে নাগরিকের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, সেটা নির্ধারিত আছে। তিনি বা সেই কর্তৃপক্ষ যদি সেই সময়ের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উত্তর না পান, তবে দ্বিতীয় পক্ষকে পড়তে হবে সমস্যায়। আর জনগণও তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

যেমন, কোনো নাগরিক জানতে চাচ্ছেন নির্দিষ্ট একটি বেসরকারি বিমান কোম্পানি আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলের যে অনুমতি পেয়েছে, তাদের দক্ষ প্রকৌশলী ও পাইলটের সংখ্যা কত এবং তারা যাত্রীসেবা ও নিরাপত্তার সব বিধি পালন করেছে কি না। নাগরিক সরাসরি ঐ বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইতে পারবেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রাইভেট বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে এইসব প্রশ্নের উত্তর চাইবে এবং পরে নাগরিককে দেবে।

উল্লেখ্য, ভারতে তথ্য অধিকার আইনে তৃতীয় পক্ষের উত্তর দেয়ার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়ায়, জনগণ এখন যেমন সঠিক সময়ে তথ্য পাচ্ছে, তেমনিভাবে দ্বিতীয় পক্ষকেও কোনো সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না।

(২) দীর্ঘসূত্রতা

আইন অনুসারে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য অধিকার আদায়ে ২১০ দিন লেগে যেতে পারে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যদি তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ তথ্য প্রদান ইউনিট ৩০ দিন সময় পাবে। ৩০ দিন পর যখন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যাবে না, তখন তথ্য চাহিদাকারী নাগরিক আপিল করলে, সেই আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা ১৫ দিন। আপিলের রায় তথ্য চাহিদাকারীর পক্ষে গেলে তথ্য পাওয়ার জন্য তাঁকে আরো ৩০ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু এর পরও যদি নাগরিক সংক্ষুব্ধ থাকেন, তাহলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭৫ দিন। তথ্য কমিশনের রায় যদি তথ্য চাহিদাকারীর পক্ষে যায়, তবে নতুনভাবে তথ্য প্রদানের সময়সীমা হবে আরো ৩০ দিন।

(৩) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য

তথ্য অধিকার আইনের ৭(ক) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত কোনো তথ্য কখনোই প্রকাশিত হবে না বা প্রকাশ করা যাবে না। এতে করে দেখা যাবে রাজনৈতিক কারণে গ্রহণ করা অনেক সিদ্ধান্ত ও কালো আইন সম্পর্কে জনগণ কোনো দিনও জানতে পারবে না। চিরকাল দেশের ইতিহাসের কিছু অংশ মানুষের অজানা রয়ে যাবে।

যেমন, আমাদের ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুথান ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ, পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারব না। এটা চিরদিন আমাদের কাছে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি অজানা বিষয় হয়ে থাকবে। সেই সময়কার সরকারের কাছে ঐসব তথ্য ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্য ঐসব তথ্য এখন প্রকাশ হওয়া উচিত। আর তাই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত তথ্যগুলো প্রকাশের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া রাষ্ট্রেরই সাংবিধানিক কর্তব্য হওয়া উচিত। এই সময়সীমা ১২ থেকে ১৫ বছর হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যগুলো সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর উন্মুক্ত হয়ে যায়।

(৪) তথ্য প্রদায়কের সুরক্ষার বিষয়টি অস্পষ্ট

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদায়কের (হুইসেল ব্লোয়ারের) সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে, তবে সেটা রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মতো সরাসরি নয়। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩১ অনুযায়ী আইন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়, এমন কোনো তথ্য অর্থাৎ যে তথ্য প্রদানে আইনি বাধা নেই এবং সেই তথ্য যদি কোনো জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপকে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে কোনো কর্মকর্তা সেই তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি তথ্য প্রকাশের কাজটি সরল বিশ্বাসে করেছেন। যদিও 'সরল বিশ্বাস' পরিমাপের কোনো পাল্লা-পাথর নেই। তবে ঐ কর্মকর্তা কেন এই তথ্য প্রকাশ করলেন, সে ব্যাপারে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনো চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না।

যেমন, কোনো একটি উপজেলার ভূমি কর্মকর্তা যদি এরকম একটি তথ্য প্রকাশ করেন যে, এলাকায় খাসজমির একটা বড় অংশ প্রভাবশালী একটি মহল দখল করে নিচ্ছে। তাহলে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে এ কাজটি তিনি জনস্বার্থে অর্থাৎ ভূমিহীন মানুষের স্বার্থে করেছেন। কারো বিরোধিতা করার জন্য নয়। জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপকে উন্মুক্ত করলে বা প্রকাশ করলে ঐ কর্মকর্তাকে সুরক্ষার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আইনে থাকলে ভালো হতো।

অথচ, জাতিসংঘের তথ্যের স্বাধীনতা (২০০০)-এর নীতিমালায় খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে তথ্য প্রদায়কের সুরক্ষার বিষয়টি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হুইসেল ব্লোয়ার প্রটেকশন অ্যাক্ট ২০০৭' এবং ব্রিটেনের 'পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিসক্লোজার অ্যাক্ট ১৯৯৮'- দ্বারা হুইসেল ব্লোয়ারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(৫) তথ্য কমিশনের মর্যাদা

আইনের ১৭ ধারা অনুসারে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা সরকার নির্ধারণ করবে। দৃশ্যত, এই পদমর্যাদার ওপর কমিশন কতটা শক্তিশালী হবে, সে বিষয়টি নির্ভর করবে। বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনারের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়। আর তথ্য কমিশনারদের পদমর্যাদা করা হয়েছে সচিব পর্যায়ে। তবে তাঁদের এই পদমর্যাদা এই সুনির্দিষ্ট কাঠামোতেই থাকবে কি না তার সরকারি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা যদি সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তাহলে সরকার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েই যায়। একইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদাও তাঁর ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

(৬) তথ্য প্রদানে রেয়াতের ব্যাপকতা

এই আইনের আওতায় জনগণ সব তথ্য পাওয়ার অধিকার পেলেও বিশেষ কিছু তথ্য কর্তৃপক্ষ জনগণকে নাও দিতে পারে বা দিতে বাধ্য নয়। তথ্য অধিকার আইনে এই ব্যতিক্রম পরিস্থিতি অনেক ব্যাপক। ধারা ৭-এর উপধারাগুলো আসলে ২০টি সুনির্দিষ্ট তথ্যকে নির্দেশ করছে না, বরং ২০টি পরিস্থিতিকে নির্দেশ করছে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট অনেক তথ্য থাকতে পারে। এই বিধিনিষেধকে একটি দুর্বলতা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এই রেয়াতসংক্রান্ত ধারা নিয়ে আইন প্রণয়নের আগে এবং এখনো ব্যাপক কথাবার্তা অর্থাৎ সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ

করে, সাংবাদিকরা তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ সংক্রান্ত এই বিধানকে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা বলে মনে করছেন। অন্যদিকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও বারবার 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের' ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরাও মনে করেন, এক্সেম্পশনের তালিকা এত বড় হওয়া উচিত নয়।

(৭) দাপ্তরিক নোট প্রসঙ্গ

২-এর চ ধারায় ***দাপ্তরিক নোট সিট বা নোটের প্রতিলিপি সংক্রান্ত*** আইনের এই বিধানটি তথ্য অধিকার আইনের মূল বিধানের পরিপন্থী। কারণ কোনো একটি বিষয়ে দাপ্তরিক নোট শিট জনগণের হাতে না এলে তারা বুঝতে পারবে না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি কেমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কার কী ভূমিকা ছিল?

ভারতে প্রথমদিকে নোট শিট প্রদানকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। পরে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপে নোট শিট দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। বাংলাদেশেও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ এই ধারাটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

(৮) বিনা মূল্যে তথ্যপ্রাপ্তি

৮-এর ৫ ধারায় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে বিনা মূল্যে তথ্যপ্রাপ্তির কথা বলা হলেও কে বা কারা এই ব্যক্তি-শ্রেণী এবং কোন তথ্য বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব তথ্য কমিশনকে দেওয়ার বিধানটি জটিল। *অথচ ভারতের আইনে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া আছে যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষগুলো সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে তথ্য পাবে বা পেতে পারে। দরিদ্রদের বিনা মূল্যে তথ্য পাওয়ার দিকটি খুবই ইতিবাচক একটি দিক। কিন্তু তথ্য কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে 'দরিদ্র' নির্ধারণ করার বিষয়টি অনর্থক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা থেকে যায়। তা ছাড়া তথ্য কমিশন কতটা দরিদ্রবান্ধব হবে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে। সেজন্য তথ্য কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করার বিষয়টি বাতিল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।*

(৯) আদালতে যাওয়ার সুযোগ

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে আবেদনকারীর বঞ্চিত হয়ে আদালতে যাওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তার প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘ ও জটিল। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে একজন নাগরিক সময়ক্ষেপণ না করেই একটি নির্দিষ্ট সময় পরেই ফেডারেল কোর্টে অভিযোগ করতে পারেন। Freedom of Information Act (১৯৬৬) অনুযায়ী আবেদনকৃত তথ্য যদি ১০ দিনের মধ্যে সরবরাহ করা না হয়, সে ক্ষেত্রে নাগরিকরা ফেডারেল কোর্টে অভিযোগ করতে পারেন। আবেদনকারীর সে তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে কি নেই, ফেডারেল কোর্টে আবেদন করার ২০ দিনের মধ্যে তা সুরাহা হয়ে যায়। আবার কোনো আবেদনকারী যদি আবেদনকৃত তথ্যের পুরো বর্ণনা দিতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে একটি যুক্তিযুক্ত বিবরণ দিলেও তাঁকে তথ্য দেয়া যায়। বাংলাদেশের আইনেও বিষয়টি এমন সহজ করা যায়।

তথ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রকাশিত তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়া ও সময়সীমা (Diagram)

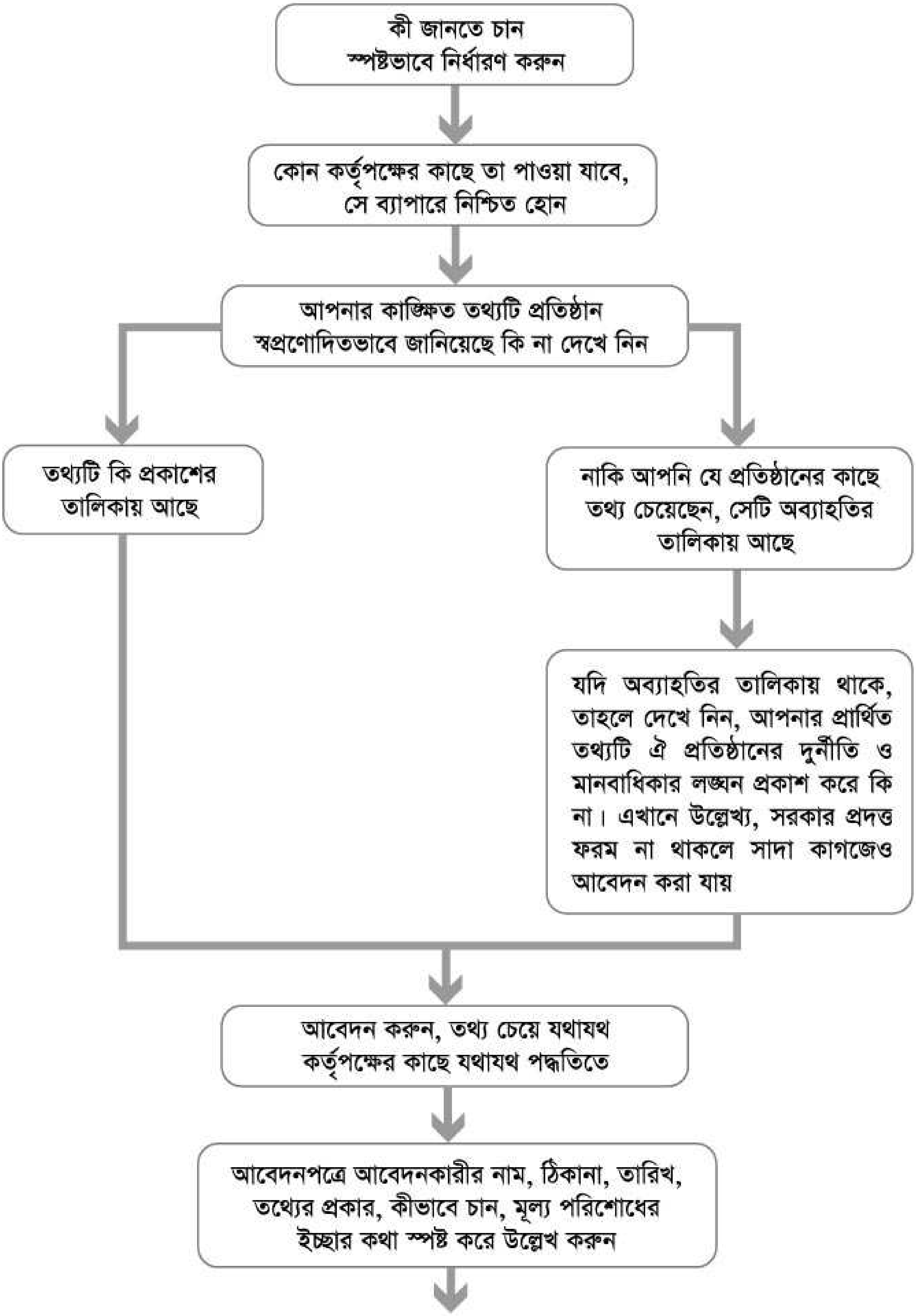

অনুরোধকৃত তথ্যর ব্যাপারে যদি একাধিক তথ্য প্রদান কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা না থাকে তবে তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ ২০ দিন অপেক্ষা করুন ধারা ৯(১)

মূল্য পরিশোধ করে তথ্য বুঝে নিন এবং রসিদ গ্রহণ করুন

তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করা না থাকলে কর্তৃপক্ষ আবেদনের ৫ দিনের মধ্যে মূল্য জানাতে বাধ্য

তথ্যমূল্য নিয়ে আপত্তি থাকলে কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারেন

তথ্য কমিশনেও অভিযোগ করতে পারেন

ক. তৃতীয়পক্ষ জড়িত থাকলে ৩০ দিন লাগতে পারে। না পেলে আপিল করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে যেতে পারেন। ধারা ৯(২)

খ. কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ জানাতে হবে আবেদন পাওয়ার ১০ কার্য দিবসের মধ্যে। ধারা ৯(৩)

গ. অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার থেকে মুক্তি-সম্পর্কিত হলে তথ্য দিতে হবে অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। ধারা ৯(৪)

ঘ. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চাইলে এবং তথ্যটি দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে দিতে হবে। ধারা ৩২(৩)

আপিল প্রক্রিয়া

তথ্য চেয়ে তথ্য কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের কাছে সব নিয়ম মেনে আবেদন করার পর যদি সময়-সংক্রান্ত কোনো জটিলতা তৈরি হয়, কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে, তবে তা সমাধানের জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হয়। আপিল কর্তৃপক্ষের কাজটি মূলত প্রশাসনিক। (অর্থাৎ, সময়মতো আবেদনকারীকে তথ্য না দিলে, তথ্য দেয়া হবে না—এটি সময়মতো না জানালে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেসব তথ্য দেয়ার কথা, সেটা না দিলে অথবা তথ্য প্রদানে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন/দুর্নীতির তথ্য প্রকাশে সময়সীমা না মানলে, আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন)। যেমন, এমআরডিআই-এর তথ্য কর্মকর্তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, তারা কোন দাতাসংস্থার কাছ থেকে কত টাকা অনুদান পাচ্ছে। তথ্য কর্মকর্তা ২০ দিনের মধ্যে তথ্য জানালেন না। তখন আপিল করতে হবে এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক (তথ্য কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন নির্বাহী) এর কাছে। তিনিই আপিল কর্তৃপক্ষ। আপিল কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য না জানালে যেতে হবে তথ্য কমিশনে।

কী কারণে আপিল করবেন তা নির্ধারণ করে নিন।

↓

কীভাবে আপিল করবেন—ব্যক্তিগতভাবে, নাকি আইনজীবীর মাধ্যমে

↓

তথ্য দেয়ার ব্যাপারে তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত লাভের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করুন।

- নির্ধারিত ছকে।
- না থাকলে সাদা কাগজে।
- ৩০ দিন পার হয়ে গেলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়েও আপিল করা যাবে।

↓

আপিল কর্তৃপক্ষ শুনানির আয়োজন করলে নির্দিষ্ট সময়ে শুনানিতে থাকতে হবে।

↓

ফলাফলের জন্য আপিল আবেদনের পর ১৫ দিন অপেক্ষা। লিখিত কপি সংগ্রহ করুন।

↓

- ১৫ দিনের মধ্যে আপিলের ফলাফল না পেলে অথবা আপিলের ফলাফলে সন্তুষ্ট না হলে তথ্য কমিশনে যেতে হবে।
- আবার আপিল কর্তৃপক্ষ যদি আবেদনকারীর আপিল খারিজ করে দেয়, তাহলেও আবেদনকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানাবেন।

তথ্য কমিশনে অভিযোগ প্রক্রিয়া

তথ্যগ্রহীতা ও তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব সমাধানের শেষ পর্যায় হচ্ছে তথ্য কমিশন। তথ্য কমিশনের মূল কাজ আধা-বিচারিক (Quasi-Judicial)।

আপিল কর্তৃপক্ষের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে তথ্য কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে, তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে, অযৌক্তিক মূল্য দাবি করলে, তথ্য কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের তথ্য পুরোপুরি সত্য না হলে বা তারা ভুল তথ্য দিলে বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য কমিশনে যাবেন।

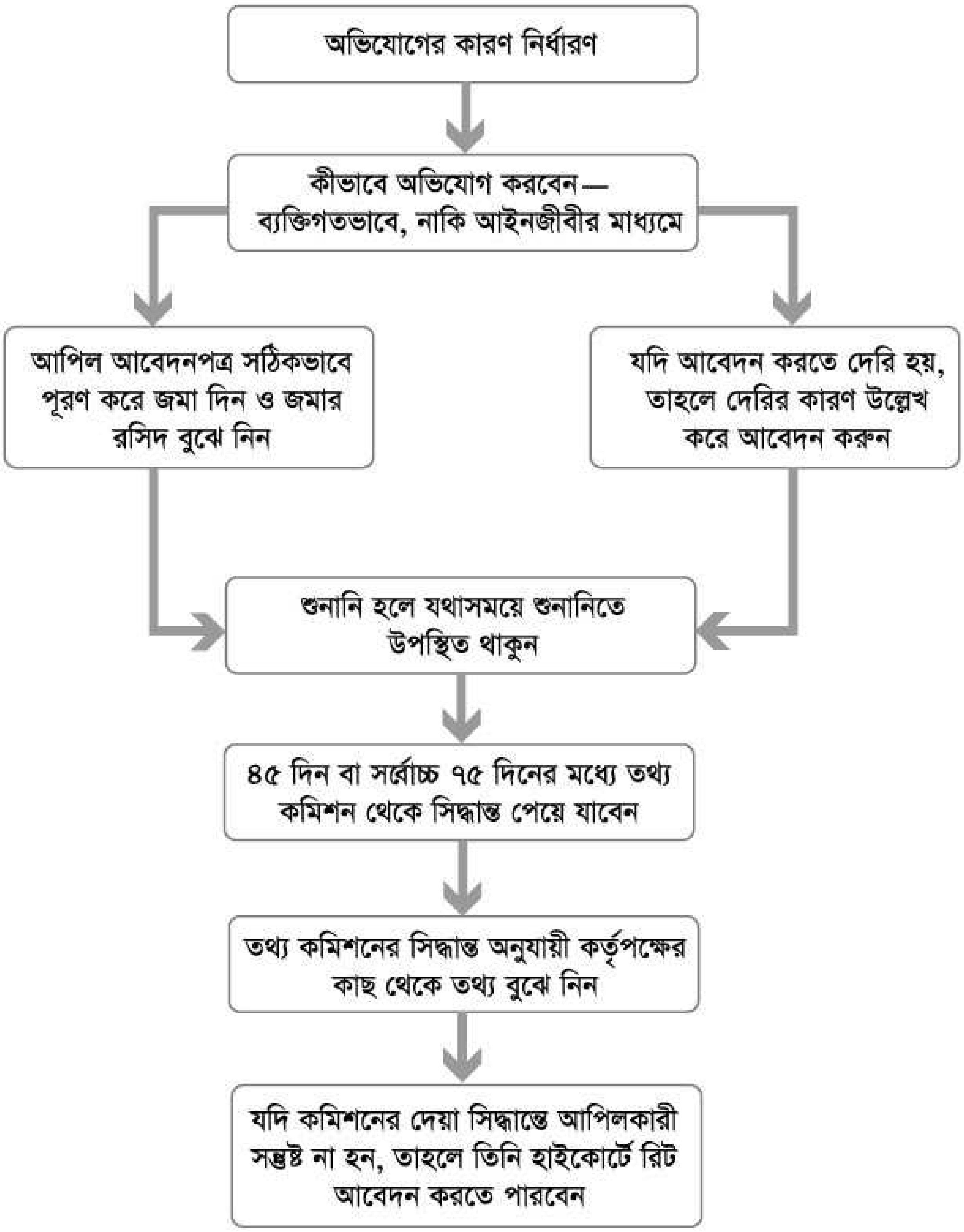

পরিশিষ্ট

তথ্য অধিকার আইন ও সরকারি গোপনীয়তা আইন

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশে জনগণের তথ্য জানার অধিকার খুবই সীমিত। চাইলেই যে-কেউ রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয়ে তথ্য জানতে পারেন না। বিভিন্ন আইনি জটিলতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহযোগিতা, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ, সাধারণের অজ্ঞতা—এসব কারণে জনগণ তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যখনই কোনো সরকারি অফিসে গিয়ে কেউ তথ্য জানতে চান, তখনই তাঁকে সরকারি গোপনীয় তথ্য বলে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কীভাবে কাজ করছে তা জানার অধিকার প্রতিটি নাগরিকেরই আছে। শুধু সাধারণ নাগরিকরাই নন, সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা সমভাবে প্রযোজ্য।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করতে গেলে সব সময়ই মাথায় রাখা দরকার যে, এই আইনের পাশাপাশি আরো একটি আইন কিন্তু এখনো কার্যকর রয়েছে এবং তা বহু আগে থেকেই। সেটি সরকারি গোপনীয়তা আইন, মতান্তরে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন বা অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট। এটি তথ্য জানার ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। নাগরিক সমাজ থেকে এই আইনটি বাতিল করার দাবি বহু দিনের। তবুও তা বাতিল হয়নি। বরং এর সহাবস্থানেই তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে।

অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট (১৯২৩) আইনটির সবচেয়ে গোলমেলে ধারা হলো ৫(১), যেখানে বলা হয়েছে :

'নিষিদ্ধ স্থানে কেউ যদি যায় বা যেতে অগ্রসর হয় কিংবা ঐ স্থানের কোনো নকশা বা স্কেচ বানায় বা কোনো গোপন তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ করে তবে সে অপরাধী হবে।' এই আইনের ৩(ক) ধারায় বলা হয়েছে যে নিষিদ্ধ স্থানের কোনো ফটো, স্কেচ বা নকশা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। ৫ ধারায় বিবৃত হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি গোপনে কোনো সংবাদ পেয়ে থাকলে সেই সংবাদ প্রকাশ করতে পারবে না। কোনো সংবাদপত্র যদি কোনো গোপন সংবাদ প্রকাশ করে তবে প্রতিবেদক, সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অপরাধী হবে এবং এসব কাজে সহায়তা করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-এর উল্লিখিত অংশগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নিষিদ্ধ স্থানের দোহাই দিয়ে সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শুরুতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যখন অনেক তোড়জোড় চলছিল, তখন অনেকেই মতামত দিয়েছিলেন উপরোক্ত ধারাটির সংশোধন ছাড়া তথ্য অধিকার আইনের প্রকৃত বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব না।

শেষমেশ তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্বতন সব আইনের ওপর নতুন আইনটির প্রাধান্যের কথা। এমনকি অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বা সরকারি গোপনীয়তা আইনও এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। *(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ : ধারা-৩—প্রচলিত অন্য কোন আইনের —ক. তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না, এবং তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।)*

এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। তবুও এই ধারার ফাঁক গলে সরকারি কর্তাব্যক্তিরা যেন কখনোই তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা আইনকে সামনে না নিয়ে আসতে পারেন সে ক্ষেত্রে সজাগ ও সচেতন থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরই হতে হবে ওয়াচডগ। কেননা এক আইনের জায়গায় আরেক আইনের অজুহাত তুলে কর্তাব্যক্তিদের বিপত্তি সৃষ্টি করার ভূরি ভূরি নজির আছে।

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন

অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বা সরকারি গোপনীয়তা আইনের বাইরেও সংবিধানের কিছু ধারাসহ বেশ কিছু আইনকানুন বাংলাদেশে তথ্য জানার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে প্রথমেই প্রণিধানযোগ্য সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদে ব্যক্তির চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হলেও বেশ কিছু শর্ত এটিকে অনেকটাই অকার্যকর করে ফেলেছে। আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হলেও এর (২) উপ-অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে আইনের মাধ্যমে আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের কথা বলা হয়েছে যার ভেতরে সবরকম দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধিগুলো পড়ে। ***(সংবিধানের অনুচ্ছেদ—৩৯ : ১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইল। ২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে, কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ। ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।)***

আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ আইনটিও সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা। একটি প্রতিবেদনকে কোন অবস্থায় আদালত অবমাননাকর মনে করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। যে লেখা বা প্রতিবেদনকে মাননীয় আদালত অবমাননাকর মনে করবেন, তা-ই হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ আদালত অবমাননার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। আদালত, বিচারক বা কোনো বিচারের রায় সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা সমালোচনা করার সুযোগ সাংবাদিকদের জন্য খুবই সীমিত।

এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির কিছু আইনও সাংবাদিকতা, তথ্য সংগ্রহ বা স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশে অন্তরায়। দণ্ডবিধির একবিংশ পরিচ্ছেদে এরকম একটি আইন মানহানিসংক্রান্ত। এ আইনের ৪৯৯ ধারায় মানহানির বিবরণ, ৫০০ ধারায় মানহানির শাস্তি ও ৫০১ ধারায় মানহানিকর বস্তু মুদ্রণের শাস্তির বিধান আছে। সম্প্রতি এসব ধারার বলে অবশ্য সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করার বিধানটি বাতিল করা হয়েছে।

এসব আইন ছাড়াও আরো কিছু আইন মাঝে মাঝে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সমস্যা সৃষ্টি করে। সেগুলো হলো :

ক. ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন, ১৯৭৩ খ. প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ গ. কপিরাইট আইন ২০০০ ঘ.বৈদেশিক সম্পর্ক আইন, ১৯৩২ ঙ. টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ চ. ডাকঘর আইন, ১৮৯৮ ছ. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং জ. ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮

এই আইনগুলোর মধ্যে অনেক আইন ব্রিটিশরা পরিবর্তন বা যুগোপযোগী করে ফেললেও আমাদের দেশে এখনো তা বহাল আছে। বিভিন্ন সরকার আইনগুলোকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক নির্যাতনেও ব্যবহার করেছে। তথ্য অধিকার আইন হয়ে গেলেও সাংবাদিকদের তথ্য-সংশ্লিষ্ট এসব আইন সম্পর্কে বিশদ জানা থাকা প্রয়োজন এবং তার প্রয়োগ ও ব্যবহার নিয়েও সজাগ থাকতে হবে।

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি ১

কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিমে দুর্নীতি

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর রিপোর্ট, ভারত

ভারতে মহারাষ্ট্রের থানে জেলা অতিদরিদ্র মানুষের আবাস এবং রাজ্যের সবচেয়ে অনুন্নত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। সেখানকার জওহর ও মোখাদা এলাকায় বসবাসরত প্রায় ৭৫ শতাংশ পরিবারের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। এসব এলাকায় যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয় মহারাষ্ট্র এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (এমইজিএস)। তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রকে আরো ব্যাপক করেছে সম্প্রতি চালু হওয়া তথ্য অধিকার আইন। এই আইনকে ব্যবহার করে জানা গেছে আসলে কীভাবে বাস্তবায়িত এই স্কিমটি। দেখা গেছে, স্কিম বাস্তবায়ন পুরো প্রক্রিয়াই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।

ইংরেজি দৈনিক দি *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে এই দুর্নীতির তথ্য অনুসন্ধানের জন্য থানে গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) কাছে প্রথম ঐ কাজের মাস্টার রোলের কপি চেয়ে আবেদন করে। পত্রিকাটি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল জেলার বোপদারি-চান্দোশি অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণকাজের জন্য যে মাস্টার রোল তৈরি করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্যের ব্যাপারে। এলাকার চরম দরিদ্র গ্রামগুলোর জন্য ঐ সড়কটি যাতে তাদের জীবনপ্রবাহ হিসেবে কাজ করে সে লক্ষ্যেই এমইজিএসের অধীনে এর নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। মাস্টার রোলে দেখা যায়, ১১ দিন রাস্তা খননের কাজের জন্য বোপদারি গ্রামের বাসিন্দা গঙ্গা ঘাটাল পেয়েছেন ৯৬১ রুপি। মাস্টার রোলে তার এই টাকা গ্রহণের টিপসইও রয়েছে। কিন্তু পত্রিকাটি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে এই মাস্টার রোল নিয়ে ছুটে যায় বোপদারি গ্রামে। সেখানে গিয়ে জানা যায় বিরাট ঘাপলার কথা। গঙ্গা ঘাটাল ২০০৪ সালে আত্মহত্যা করেছেন এবং তিনি বা তাঁর পরিবার কোনো টাকাপয়সা পায়নি। এ রকম এক গঙ্গা ঘাটালই নন, তাঁর মতো আরো অনেক মৃত ব্যক্তির নাম রয়েছে এমইজিএসের মাস্টার রোলে, যাঁরা টাকা পেয়েছেন বলে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাসহ বেশ কিছু ভুতুড়ে নামও ওই মাস্টার রোলে রয়েছে। এসব তথ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার পর রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিষয়টি আমলে নিতে বাধ্য হন।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

এখানে দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি দরিদ্র এলাকা। সাধারণত, দরিদ্র এলাকাকে ঘিরে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা দেখা যায়, কিন্তু সেখানে উন্নতির দেখা মেলে না। অর্থাৎ অনিয়ম-দুর্নীতি সেখানে হচ্ছে, এটা ধরেই নেয়া যায়। কিন্তু তার অনুসন্ধান হবে কীভাবে? কোন মাধ্যমে তারা এগোবেন? তাই তথ্য অধিকার আইন চালু হতেই তারা তার আশ্রয় নিলেন। অকাট্য তথ্য-প্রমাণ হাতে নিয়েই রিপোর্ট করা হলো এবং তা আলোচনার ঝড় তুলল।

কেস স্টাডি ২

কানাডার এমপিরা কি আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত?

টরন্টো সান, কানাডা

কানাডার এমপিরা কি বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত? কানাডার রাজনীতি, মিডিয়া এবং সুধীমহলে এই প্রশ্নটি এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। হাউজ অব কমন্সের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করতে অডিটর জেনারেলের উদ্যোগ এবং সংসদ কর্তৃক তাতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় এসব প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি বেশ কিছু এমপির বিরুদ্ধে তাদের কর্মচারীরা মামলা করেন। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় এমপিরা এখন এসব মামলা মোকাবিলা করছেন। এমপিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে চাকরিচ্যুতি থেকে শুরু করে যৌন হয়রানির অভিযোগও রয়েছে ।

কানাডার অডিটর জেনারেল শিলা ফ্রেশার হাউজ অব কমন্সের স্পিকারকে চিঠি লিখে সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। চিঠিতে অডিটর জেনারেল অ্যাক্টের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, অ্যাক্টে কানাডার হিসাব নিরীক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অডিটর জেনারেলকে। কানাডার হিসাবের মধ্যে হাউজ অব কমন্সের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। সেই ক্ষমতাবলে তিনি সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করতে চান।

অডিটর জেনারেলের চিঠি সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করলেও হাউজ অব কমন্স থেকে তার কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। টানা ১০ মাস অপেক্ষা করার পর অডিটর জেনারেল যখন মিডিয়াতে মুখ খোলেন, সংসদের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করা নিয়ে তখনই সক্রিয় হয়ে ওঠে হাউজ অব কমন্স।

হাউজ অব কমন্সের আয়-ব্যয় দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত সংসদীয় কমিটি বোর্ড অব ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে অডিটর জেনারেলের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। উল্লেখ্য, স্পিকার স্বয়ং এই বোর্ডের চেয়ারম্যান। আট সদস্যের এই বোর্ডে সব কটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রয়েছেন। এই কমিটি প্রতিবছর হাউজ অব কমন্সের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বাজেট নজরদারি করে।

বোর্ডের বৈঠকে বলা হয়, এমপিদের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের তথ্য ২০০০ সাল থেকেই সংসদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। এমপিরা প্রচলিত নীতিমালা, আইন এবং নির্দেশনা অনুসরণ করেই অর্থ ব্যয় করে থাকেন। এমপিদের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা অডিটর জেনারেলের ম্যান্ডেটের আওতার বাইরে।

কুইন্স ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিড ফ্র্যাংকস বলেছেন, যুক্তরাজ্য ও কানাডার নোভাস্কশিয়ায় রাজনীতিকদের, বিশেষ করে এমপিদের নজিরবিহীন আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় কানাডার এমপিরা আর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

কানাডার নোভাস্কশিয়ার অডিটর জেনারেল প্রাদেশিক সংসদের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষার পর বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির প্রমাণ পেয়েছেন। তিনি বেশ কয়েকজন বর্তমান ও সাবেক এমপির বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার

ভয়েই কানাডার এমপিরা তাঁদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করতে দিতে চাইছেন না।

এদিকে এমপিরা তাঁদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষায় অডিটর জেনারেলকে বাধা দিচ্ছেন, এই খবরে সাধারণ জনগণের মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এমপিরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের প্রশ্নের মুখে কোনো উত্তর দিতে না পেরে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায়ই জনগণ জানতে চাইছে, কানাডার এমপিদের লুকোনোর মতো এমন কী আছে? জনমত জরিপেও দেখা যাচ্ছে সিংহভাগ নাগরিক চান, এমপিদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা এবং সেই তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ হোক।

কেস স্টাডি ৩

স্পিকারের রুলিং সত্ত্বেও তথ্য প্রকাশে সরকারে গড়িমসি

নতুনদেশ ডটকম, কানাডা থেকে প্রকাশিত বাংলা অনলাইন পত্রিকা

কানাডার হাউজ অব কমন্সের স্পিকারের দেওয়া রুলিংকে তেমন একটা আমলেই নেয়নি ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সরকার। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সেনাবাহিনীর স্পর্শকাতরতার ধুয়া তুলে তারা কালক্ষেপণ করে যাচ্ছে। সংসদের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা সমঝোতা না হওয়ায় স্পিকার পিটার মিলিকেন সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কানাডিয়ান সেনাসদস্যদের হাতে আফগানিস্তানে বন্দীরা নিগৃহীত হয়েছে, এমন অভিযোগের দলিলপত্র সংসদে প্রকাশ করাকে ঘিরে কানাডার রাজনীতিতে নাটকীয় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার এই দলিলটি সংসদে প্রকাশে অস্বীকৃতি জানালে হাউজ অব কমন্সের স্পিকার এক রুলিং দেন। তিনি বলেন, সরকারি কোনো দলিল সেন্সরবিহীনভাবে সংসদে উপস্থাপনের জন্যে সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে হাউজ অব কমন্স। তিনি ১৪ দিনের মধ্যে আফগান নির্যাতনসংক্রান্ত দলিলটি সেন্সরবিহীনভাবে সংসদে উপস্থাপনের কিংবা সব দলের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্যে পৌঁছার নির্দেশ দেন।

স্পিকারের রুলিংয়ের পর থেকেই সরকার ও বিরোধী দলের এমপিরা লাগাতার বৈঠক করে যাচ্ছেন। তবে এখন পর্যন্ত তাঁরা কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে পারেননি। জাস্টিস মিনিস্টার রব নিকোলসন বলেন, 'আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী।' এই মন্তব্যের বাইরে কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। আর বিরোধী লিবারেল পার্টির হাউজ লিডার রালফ গোডেল বলেছেন, সময় বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত যৌক্তিক এবং প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, একটা গ্রহণযোগ্য সমঝোতার লক্ষ্যে সবাই আন্তরিকতার সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সমঝোতায় পৌঁছতে না পারলে সরকার সংসদ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবে। সে ক্ষেত্রে নতুন নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

এই রিপোর্ট দুটিতে দেখা যাচ্ছে, সাংবাদিকরা কীভাবে সংসদ, সংসদে উত্থাপিত তথ্যকে সূত্র ধরে তা পত্রিকায় তুলে ধরেছেন। প্রথম রিপোর্টে এমপিদের বিরুদ্ধে তাদের কর্মচারীদের মামলার

ঘটনায় অডিটর জেনারেল অফিস ও হাউজ অব কমন্সের স্পিকারের মধ্যে চিঠি চালাচালি থেকেই বেরিয়ে পড়েছে স্পর্শকাতর সব তথ্য এবং তা প্রকাশের আইনি বাধ্যবাধকতার দিকটি। দ্বিতীয় রিপোর্টে সংসদে একটি দলিল প্রকাশের বৈধতা নিয়ে স্পিকারের রুলিং দেওয়ার ঘটনা থেকে বেরিয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ধুয়া তুলে সরকারের তথ্য গোপনের প্রবৃত্তি। প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের সঙ্গে হাউজ অব কমন্সের স্পিকারের মধ্যে এই বিরোধ সরকার পতনের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আর এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসে সরকারি দলিল প্রকাশে সংসদের ক্ষমতার আইনি দিকটি।

কেস স্টাডি ৪

যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপানের অভিজ্ঞতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য অধিকার আইন রয়েছে 'Freedom of Information' আইন নামে। এর মাধ্যমে সেখানে অনেক নাগরিক সংস্থা ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করে এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে, যা আগে জনগণ জানতে পারত না এবং গোপন রাখা হতো। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কোনো ওষুধের বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য, আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের ক্রটি বা দুর্ঘটনাজনিত তথ্য, যা আশপাশের লোকজন ও প্রাণীর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, এমন বিষয়। এসব তথ্যের মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তা বিষয়ে আন্দোলন করে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে এবং জননিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধী দল তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে সরকারের নথিপত্র দেখার মাধ্যমে নাইজেরিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত একটি তেল চুক্তির শর্ত উদ্‌ঘাটন করে। তারা জানতে পারে, এই চুক্তির সুফল জনগণ পাচ্ছে না, পাচ্ছে একটি বিদেশি কোম্পানি। ফলে সরকারকে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা হয়।

জাপানে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে জানতে পারে, 'মিনামাতা' (এক রকম বিষাক্ত রাসায়নিক) রোগ বিস্তারের কথা। এই রোগটি শুধু একটি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে ছড়িয়েছে—সরকার অন্যায়ভাবে ঘোষণা করে জনগণকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। সরকারের সুবিধা ছিল, এর ফলে বেশি ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু এটা জানাজানি হলে অনেক বেশি ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সক্ষম হন।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

এখানে আলোচিত তিন দেশের অভিজ্ঞতাটি সরাসরি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রকাশিত কোনো ঘটনা নয়। তবে এর মাধ্যমে সাংবাদিকরা বিবেচনায় নিতে পারেন, তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন সংগঠন এমনকি বিরোধী দলও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ব্যাপারে কীভাবে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায় করে নিতে পারে।

কেস স্টাডি ৫

সরকার তথ্য অধিকার আইন আমলে নিচ্ছে না

প্রকাশ : ২৩ মে, ২০১০

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি অভিযোগের তথ্য সংগ্রহে খোদ তথ্য কমিশনই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।

রাজউকের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে কমিশন রাজউক চেয়ারম্যান বরাবর আরেকটি চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই কর্মকর্তার নাম পাওয়ার পর রাজউকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)-এর নোটিশের শুনানি গ্রহণ করবে কমিশন। বেলার অভিযোগ, তথ্য প্রদানের ব্যাপারে রাজউক তাদের অনুরোধে কর্ণপাত করছে না। কমিশনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, একই ধরনের একটি চিঠি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কেও দেয়া হবে এবং তথ্য সরবরাহের জন্য তাদের একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিয়ে তার নাম/পদবি ইত্যাদি কমিশনের কাছে পাঠাতে বলা হবে।

রাজউক-এর হাতিরঝিল প্রকল্পের মধ্যে বিজিএমইএ ভবনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য চেয়ে তা পেতে ব্যর্থ হয় বেলা। তথ্য না পেয়ে গত মার্চ মাসে বেলা এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আধা-বিচারিক সংস্থা তথ্য কমিশন রাজউককে তথ্য সরবরাহের জন্য অবিলম্বে তাদের একজন কর্মকর্তার নাম কমিশনের কাছে পাঠাতে চিঠি দেয়।

রাজউক চেয়ারম্যান নুরুল হুদা সোমবার (১৭ মে, ২০১০) *নিউ এজ*কে বলেন, দু-এক দিনের মধ্যেই আমরা আমাদের তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তথ্য কমিশনে পাঠাব। তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য সরবরাহের জন্য ইতিমধ্যেই রাজউকের সদস্যকে (পরিকল্পনা) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তবে বৃহস্পতিবার (২০ মে, ২০১০) পর্যন্ত তথ্য কমিশন কোনো নাম পায়নি বলে তাদের একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন।

রাজউক চেয়ারম্যান অবশ্য হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকার মধ্যে নির্মিত বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) বিতর্কিত ভবন বিষয়ে তথ্য চেয়ে বেলার কোনো চিঠি প্রাপ্তির ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বেলার অভিযোগ, জলাশয় সংরক্ষণ সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে ওই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন, তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজউক বা তথ্য কমিশন কারো কাছ থেকেই কোনো সাড়া পাননি।

উল্লেখ্য, দেশের সব নাগরিকেরই তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন তাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর অধীনে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে পারে। আইনটি গত বছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।

আইন অনুযায়ী ২০ কর্মদিবসের মধ্যে কোনো কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র জমা দেয়ার ১০ দিনের মধ্যে বিষয়টি আবেদনকারীকে জানাতে হবে। আর আইন অনুযায়ী কোনো অভিযোগ পেলে ৪৫ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য কমিশন তার নিষ্পত্তি করবে।

তথ্য অধিকার আইনে রয়েছে, প্রতিটি সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা তথ্য সরবরাহের জন্য তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেবে। কিন্তু আইনটি কার্যকর হওয়ার ১০ মাস পরেও তথ্য কমিশন কিংবা সরকারি প্রশাসনে তথ্য সরবরাহের জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই বলে ওই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন। যদিও আইনটি কার্যকর হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরে তথ্য প্রদানে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা।

নিজস্ব কোনো জনবল না থাকায় তিন সদস্যের তথ্য কমিশনও তেমনভাবে কাজ করতে পারছে না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সবেমাত্র তথ্য কমিশনের কাছে তাদের মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম পাঠাতে শুরু করেছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে তথ্য সরবরাহ ইউনিট গঠনের জন্য এযাবৎ কেউ কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির এর আগে বলেছেন, একটি আধা-বিচারিক সংস্থা হিসেবে কমিশন বর্তমানে জনবল নিয়োগ ও কাজ শুরু করার জন্য গ্রাউন্ডওয়ার্ক করছে।

*নিউ এজ*কে তিনি বলেন, কমিশন একটি অভিযোগ পেয়েছে এবং সেটির নিষ্পত্তি করতে খুব শিগগিরই পদক্ষেপ নেবে। অভিযোগটির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু না জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁরা তথ্য চেয়ে না পেয়ে করা বিভিন্ন আবেদন পাচ্ছেন, তবে সেগুলোকে ঠিক অভিযোগ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

এর আগে তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য সরবরাহ ইউনিট গঠনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনীত করতে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি দপ্তরে নির্দেশ পাঠিয়েছিল বলে একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান।

কোনো নাগরিক যদি সরকারি তথ্য পেতে চান, তাহলে তাঁকে নির্দিষ্ট ফরমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে। তবে ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে। তবে কোনো নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট কিছু ফি দিতে হবে বলে তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইনের ওপর ২৩ মে, ২০১০ তারিখে ইংরেজি দৈনিক *নিউ এজ* পত্রিকায় প্রথম পাতায় গুরুত্ব সহকারে 'সরকার তথ্য অধিকার আইন আমলে নিচ্ছে না' শিরোনামে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করে। রিপোর্টটি মূলত সরকারি সংস্থাগুলো যে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতাকে আমলে নিচ্ছে না, সে বিষয়ে। ঠিক তথ্য অধিকার আইনকে ব্যবহার করে কোনো প্রতিবেদন এটি নয়। বরং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করেও যে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাচ্ছে না বা তথ্য পেতে বাধা বা হয়রানির শিকার হচ্ছে তার ওপর প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে। আবার তথ্য দিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসা বা তথ্য অধিকার আইন এখনো যে সরকারি পর্যায়ে তেমন সচেতনতা সৃষ্টি

করতে পারেনি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সে বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল প্রতিষ্ঠান 'তথ্য কমিশন' যে এখনো সেভাবে কাজ শুরু করতে পারেনি, তাও বেরিয়ে এসেছে এই রিপোর্টের মাধ্যমে।

প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের এই প্রতিবেদনের সূত্র 'বেলা' নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। যারা সরকারি প্রতিষ্ঠান রাজউকের কাছে তাদের আওতাধীন একটি প্রকল্প এলাকার মধ্যে দৃশ্যত অবৈধভাবে একটি ভবন কীভাবে নির্মিত হলো সে সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিল। কিন্তু আইন মেনে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়েও তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর জবাব পায়নি। এ পর্যায়ে বেলা রাজউক-এর কাছ থেকে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনের কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। (অবশ্য আইন অনুযায়ী বেলার এ ক্ষেত্রে প্রথম অভিযোগ করার কথা প্রতিষ্ঠান-প্রধান রাজউক চেয়ারম্যানের কাছে। বেলা সে কাজটি করেছে কি না তা অবশ্য রিপোর্টে আসেনি। সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান যে তথ্য চাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন বা কেন নন (রিপোর্টের লাইনটানা বাক্য দ্রষ্টব্য) তা আরো স্পষ্ট হওয়া যেত। দেখা গেছে, পরে তথ্য কমিশনও রাজউকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ রিপোর্ট প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সে ব্যাপারে সন্তোষজনক কোনো জবাব পায়নি। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও এর কার্যকারিতার বাস্তব চিত্রটিই চমৎকারভাবে এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। কাজেই সাংবাদিকদের শুধু তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রিপোর্ট করা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে গিয়ে কী সমস্যায় পড়ছেন, তাতে উপকার পাচ্ছেন কি না এবং তা নতুন কোনো ঘটনার জন্ম দিচ্ছে কি না সে বিষয়েও সচেতন থাকা জরুরি, যা তাকে আরো বেশি বেশি সংবাদ-ঘটনার কাছাকাছি নিয়ে যাবে।

আরো কোনো রিপোর্ট কী হতে পারত

দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক বেলা বা তথ্য কমিশনের সূত্র ধরে প্রতিবেদনটির অবতারণা করেছেন। কিন্তু প্রতিবেদনটি করতে গিয়ে তিনি মূল যে তথ্যের (যে তথ্যটি তালাশ করছিল বেলা, অর্থাৎ হাতির ঝিল প্রকল্পে নির্মিত বিজিএমইএ ভবনটি অবৈধ কি না) সন্ধান পেয়েছেন, প্রতিবেদক ইচ্ছা করলে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য নিজেও রাজউকের কাছ থেকে তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারতেন। এতে দুটি কাজ হতো—১.তথ্য অধিকার আইন মেনে চলা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে নিজের একটি অভিজ্ঞতা হতো, যার কথা ঐ প্রতিবেদনেও আসতে পারত ২. বিজিএমইএ ভবন নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য তথ্য আহরিত হতো, যার সূত্র ধরে তাঁর এগিয়ে যাওয়া সহজ হতো।

তথ্যসূত্র

- **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়**—এপ্রিল, ২০০৮
- **বাংলাদেশ গেজেট : তথ্য অধিকার আইন**—৬ এপ্রিল, ২০০৯
- ***তথ্য অধিকার কর্মীর হ্যান্ডবুক*, অনন্য রায়হান ও মিজানুর রহমান**—প্রকাশ : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ২০০৯
- ***তথ্য অধিকার আইন সহজপাঠ***—প্রকাশ : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০০৯
- ***ক্যাম্পেইন ফর আরটিআই ইন বাংলাদেশ***—প্রকাশ : ফায়ার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
- ***তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ***—প্রকাশ : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, ২০১০
- ***তথ্য অধিকার আইনে এক্সেম্পশন বা রেয়াত***—মিজানুর রহমান খান
- ***তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার : সমস্যা ও সম্ভাবনা***—প্রকাশ : এমএমসি, ২০০২
- ***মানবাধিকার ও সাংবাদিকতা তথ্যপঞ্জি***—প্রকাশ : বিসিডিজেসি, ২০০৯
- ***ইয়োর গাইড টু ইউসিং দি রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ২০০৫***—সিএইচআরআই, নয়াদিল্লি

সংযুক্তি

সংযুক্তি : ১

কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে একটি চিঠির নমুনা

জনগণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং যেকোনো ধরনের প্রকল্প ইত্যাদি সব বিষয়ে সরকারের কাছে এবং সরকারি ও বিদেশি সহযোগিতায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য জানতে চাইতে পারেন।

তবে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য জানতে হলে প্রথমেই স্পষ্ট করে নিতে হবে কী তথ্য চাইছেন; আর এই তথ্য জানার জন্য কার কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

যত দিন পর্যন্ত সরকার কোনো নির্দিষ্ট ফরম চালু না করে, তত দিন একটি সাদা কাগজে নাম, ঠিকানাসহ চিঠি লিখলেই চলবে আবেদনকারীর। তবে আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তাকে জানতে হবে কী পদ্ধতিতে তথ্য পেতে চান? তথ্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফি দিতে প্রস্তুত কি না, দরখাস্তে নির্ধারিত তারিখ ও স্বাক্ষর থাকতে হবে। প্রয়োজনে অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য অর্থাৎ ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন, এটা বোঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য দেয়া যেতে পারে।

নির্দিষ্ট ফরম পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে আবেদনপত্রের নমুনা

তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রতি
দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা
উপজেলা কৃষি অফিস
ডোমার
নীলফামারী

বিষয়: এলাকার কোন ডিলার কত বস্তা সার পাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক সারের নির্ধারিত মূল্য কত ধরা হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের কপি ও ডিলারদের নামের তালিকা।

মহোদয়,

আমি একরাম হোসেন, বাংলাদেশের একজন নাগরিক এবং কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। আমার ঠিকানা—গ্রাম : খাটুরিয়া, উপজেলা : ডোমার। আমি বাংলাদেশের 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে আপনার কাছে নিম্নলিখিত তথ্যের জন্য আবেদন করছি।

যা জানতে চাই :

- এই বছর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে নির্দিষ্ট সার ডিলারের সংখ্যা কত এবং কোন ডিলার কত বস্তা সার পাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক সারের নির্ধারিত মূল্য কত।

যেভাবে তথ্য চাই : নামের তালিকা, সিদ্ধান্তের কপি, সারের নির্ধারিত মূল্যের ফটোকপি।

আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী আগামী ২০ দিনের মধ্যে আপনার কাছ থেকে এই তথ্য পাব বলে আশা করছি। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি আপনাদের অফিসে এসে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র, ফাইল দেখতে চাই এবং প্রয়োজনীয় অংশের ফটোকপি/অনুলিপি নিতে চাই। এর জন্য যথাযথ মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি।

স্বাক্ষর :
নাম : একরাম হোসেন
গ্রাম : খাটুরিয়া
থানা/উপজেলা : ডোমার

সংযুক্তি : ২

বাংলাদেশ গেজেট : তথ্য অধিকার আইন

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩ শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কৃর্ক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২ শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের—

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ব্যতীত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে—

(ক) "আপীল কর্তৃপক্ষ" অর্থ—

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান :

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ—

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(ঋ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) “কর্মকর্তা” অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “তথ্য প্রদান ইউনিট” অর্থ—

(অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(ঙ) “তথ্য কমিশন” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;

(চ) “তথ্য” অথ্যে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ছ) “তথ্য অধিকার” অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;

(জ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঝ) “তৃতীয় পক্ষ” অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত জড়িত অন্য কোন পক্ষ;

(ঞ) “দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(ট) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঠ) “প্রবিধান“ অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ড) “বাছাই কমিটি” অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঢ) “বিধি” অর্থ ধারা ৩৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি।

৩। আইনের প্রাধান্য।—প্রচলিত অন্য কোন আইনের—

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী দ্বার ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি

৪। তথ্য অধিকার।—এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫। তথ্য সংরক্ষণ।—(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) **প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ** যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

৬। তথ্য প্রকাশ।—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ–

(ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;

(খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ উহার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন উহার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তাহার সহিত কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে সেই সকল শর্তের বিবরণ;

(ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

(৪) কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এবং, প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যম অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করিবে।

(৮) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

৭। **কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামুলক নয়।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা ঃ—

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ–

(অ) আয়কর, শুল্ক,ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ।—(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা ঃ-

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যবালী সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রেমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে ঃ

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং, প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

৯। তথ্য প্রদান পদ্ধতি।— (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত

হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন— তথ্যের মুদ্রিত মূল্য ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়াছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুয়ায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কার্যালয় সৃষ্টি করিলে, উক্তরূপ কার্যালয় সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কার্যালয় তথা নবসৃষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হইলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হইলে সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

১১। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১২। তথ্য কমিশনের গঠন।—(১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২ (দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে অন্যূন ১ (এক) জন মহিলা হইবেন।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) তথ্য কমিশনের কোন পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে তথ্য কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করিলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হইলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করিয়া, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হইলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হইলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইলে বা যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইলে;

(চ) এই আইনের অধীনে তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হইয়া অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তথ্য কমিশন বা ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারী করা এবং শপথ পূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়।

(৪) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ অনুসন্ধানকালের তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) অথ্য কমিশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও, ক্ষেত্রমত, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;

(গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহা দূরীকরণার্থে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান; (ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যম গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;

(ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং

(ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১৪। বাছাই কমিটি।—(১) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(গ) সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য;

(ঘ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত এমন অথবা গণমাধমের সহিত সম্পর্কিত সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) তথ্য মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে, উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।—(১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন।

(২) ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর কিংবা ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেইটি আগে ঘটে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ একই পদে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, তবে কোন তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হইবেন না।

(৫) আইন, বিচার, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা বা জনপ্রশাসনে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞাতার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৬) প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) প্রধান তথ্য কমিশনারের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান তথ্য কমিশনার পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ।—(১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত প্রদান তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি প্রধান তথ্য কমিশনার বা অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

১৭। তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।—প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৮। তথ্য কমিশনের সভা।—(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তথ্য কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যিনি তথ্য কমিশনার হিসাবে জ্যেষ্ঠতম তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যে কোন ১ (এক) জনের উপস্থিতিতে তথ্য কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) তথ্য কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৯। তথ্য কমিশন তহবিল।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তথ্য কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির সাপেক্ষে, তথ্য কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তথ্য কমিশন তহবিল হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তথ্য কমিশন তহবিল নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

২০। বাজেট।—তথ্য কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২১। তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।—(১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে তথ্য কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ কবিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা তথ্য কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) তথ্য কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তথ্য কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও তথ্য কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তথ্য কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২৩। তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।—(১) তথ্য কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন তথ্য কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, তথ্য কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

আপীল, অভিযোগ, ইত্যাদি

২৪। আপীল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার, বা ক্ষেত্রমত সিদ্ধান্ত লাভ করিবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা

(১) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে—

(ক) আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীল আবেদনটি খারিজ করিয়া দিবেন।

(৪) উপ–ধারা (৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ধারা ৯ এর, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত ত্যথ সরবরাহ কবিবেন।

২৫। অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।—(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;

(গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তথ্য কমিশন উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির এর কিংবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করিবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া প্রধান তথ্য কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তথ্য কমিশন উহার সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তাহার সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হইলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হইবে না।

(১১) এই ধারার অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ—

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধান মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন, যথা ঃ—

(অ) অনুরোধকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রদান;

(আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;

(ই) বিশেষ কোন তথ্য বা বিশেষ ধরনের তথ্যাবলী প্রকাশ;

(ঈ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের পালনীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;

(উ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ;

(ঊ) কোন ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(খ) এই আইনে বর্ণিত কোন জরিমানা আরোপ করা;

(গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা;

(ঘ) অভিযোগ খারিজ করা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতনভাবে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ;

(চ) তথ্যে প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান।

(১২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১৩) তথ্য কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১৪) তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৬। **প্রতিনিধিত্ব**।—কোন অভিযোগের পক্ষসমূহ তথ্য কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবে।

২৭। জরিমানা, ইত্যাদি।—(১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা—

(ক) কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;

(খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করিতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;

(ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করিয়াছেন;

(ঙ) কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন—

তা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উপ-ধারা (১) এর বর্ণিত কার্য করিয়া কোন কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তথ্য কমিশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় অধীন পরিশোধযোগ্য কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act.1913 (Act lX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

২৮। Limitation Act, 1908 এর প্রয়োগ।—এই আইনের অধীন আপীল বা অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (Act lX of 1908) এর বিধানাবলী, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যতদূর সম্ভব, প্রয়োজ্য হইবে।

২৯। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।—এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া গণ্য কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে, এই আইনে উল্লিখিত আপীল অর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের ব্যতীত, কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩০। **তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) প্রতি বৎসরের ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বৎসরের নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা;

(খ) অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ;

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সংগৃহীত উপযুক্ত মূল্যের পরিমাণ;

(চ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ;

(ছ) নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব;

(জ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা;

(ঝ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ;

(ঞ) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ও উহার বিবরণ;

(ট) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার মোট পরিমাণ;

(ঠ) তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা;

(ড) তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব;

(ঢ) তথ্য কমিশনের বিবেচনায় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এইরূপ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়;

(ণ) এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালনে কোন কর্তৃপক্ষের অনীহা পরিলক্ষিত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত প্রতিবেদন তথ্য কমিশন বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তথ্য কমিশন, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ বা তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৩২। কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নাহে।—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৪) তফসিলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকার তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৩। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

৩৬। মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ।—এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এতদ্দ্বারা তথ্য অধিকার অদ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

(ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য)

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ
(১)	(২)
১।	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
২।	ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)।
৩।	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ।
৪।	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি,) বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)।
৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
৭।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৮।	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর গোয়েন্দা সেল।

আশফাক হামিদ
সচিব

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

সংযুক্তি : ৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ কার্তিক ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/২৭ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৩৮-আইন/২০০৯।—তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই বিধিমালা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(১) "আইন" অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন);

(২) "আপীল কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২(ক) তে সংজ্ঞায়িত আপীল কর্তৃপক্ষ;

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ;

(৪) "তথ্য" অর্থ আইনের ধারা ২(চ) তে সংজ্ঞায়িত তথ্য;

(৫) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৬) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(৭) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা; এবং

(৮) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে সংযোজিত কোন ফরম।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকার।— কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য ফরম "ক" অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে অথবা ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইল এর মাধ্যমে আবেদন পত্র গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে আবেদনের রেফারেন্স নম্বর, আবেদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদমর্যাদা এবং আবেদন গ্রহণের তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) ইলেকট্রনিক বা ই-মেইল এর মাধ্যম আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন প্রেরণের তারিখই (প্রাপ্তি সাপেক্ষে) আবেদন গ্রহণের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। তথ্য প্রদান, ইত্যাদি।— (১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ তথ্য প্রদানের তারিখ এবং সময় উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ইউনিট বা কর্তৃপক্ষকে এতৎসম্পর্কে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানের পূর্বে এই মর্মে নিশ্চিত হইবেন যে, আবেদনকারী কর্তৃক প্রার্থীত সকল রেকর্ড তাহার দপ্তরে অথবা কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারী কর্তৃক চাহিত তথ্য আইনের বিধানের আলোকে প্রদান করিবেন।

(৪) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রয়োজনে, একজন সহায়তাকারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং আবেদনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হইলে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে তাহার পছন্দমত সহায়তাকারী সঙ্গে নিয়া আসিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়টি আবেদন পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) আইনের অধীন প্রদত্ত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে" মর্মে প্রত্যয়ন করিতে হইবে এবং উহাতে প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল থাকিবে।

৫। তথ্য সরবরাহে অপারগতা।— ধারা ৯এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে আবেদনকারীর প্রার্থিত তথ্য সরবরাহে অপারগ অথবা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৯) এর বিধান অনুযায়ী আংশিক তথ্য সরবরাহে অপারগ হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির (১০) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম "খ" অনুযায়ী এতদ্‌বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

৬। আপীল আবেদন, ইত্যাদি।—(১) আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট ফরম "গ" অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল করিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ কোন আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) সংশিষ্ট বা স্বার্থ সংশিষ্ট ব্যক্তির শপথের ভিত্তিতে অথবা হলফনামার ভিত্তিতে মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ;

(খ) ডকুমেন্টস, পাবলিক রেকর্ডস বা উহার কপিসমূহ পর্যালোচনা বা, প্রয়োজনে, পরিদর্শন;

(গ) অধিকতর বিবরণ বা ঘটনা তদন্ত;

(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার শুনানী গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনে তৃতীয় কোন পক্ষের শুনানী গ্রহণ;

(চ) হলফনামার ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ।

(৩) আপীলকারীর শুনানীর অন্যূন ৩ (তিন) দিন পূর্বে শুনানীর তারিখ সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) আপীলকারীর শুনানীর সময়ে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে শুনানীতে অংশগ্রহণ করিতে বাধাগ্রস্ত হইয়াছেন সেইক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপীলকারীকে শুনানীর জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান করিবেন।

৭। ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি।—আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, ইন্টারনেট সংযোগ সার্বক্ষণিক সচল রাখিবে যাহাতে জনসাধারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন পত্র দাখিল এবং তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

৮। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যে মূল্য নির্ধারণ, ইত্যাদি।—(১) ফরম "ঘ" অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যে নির্ধারিত মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন তথ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবেদনকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদেয় ফি নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে।

তফসিল

ফরম 'ক'

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	: ....
	পিতার নাম	: ....
	মাতার নাম	: ....
	বর্তমান ঠিকানা	: ....
	স্থায়ী ঠিকানা	: ....
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	: ....
	পেশা	: ....
২।	কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)	: ....
৩।	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)	: ....
৪।	তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	: ....
৫।	প্রযোগ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	: ....
৬।	তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	: ....
৭।	আবেদনের তারিখ	: ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম ‘খ’

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর : তারিখ : ....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম : ....

ঠিকানা : ....

বিষয় : তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা :—

১। ....

....।

২। ....

....।

৩। ....

....।

(.............................)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম

পদবী

দাপ্তরিক সীল

ফরম ‘গ’

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

আপীল আবেদন

১।	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ....
২।	আপীলের তারিখ	: ....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	: ....
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: ....
৫।	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: ....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: ....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: ....
৮।	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: ....
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: ....

আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারিত ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথাঃ—

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনা মূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্যে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

মোঃ মাছুম খান(উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

সংযুক্তি : ৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৮, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/৭ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৬৭-আইন/২০১০।–তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৬। আপীল আবেদন, ইত্যাদি।–(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করিবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট ফরম 'গ' অনুযায়ী আপীল আবেদন দাখিল করিবেন"।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ কোন আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার শুনানী গ্রহণ;

(খ) আপীল আবেদনে উল্লিখিত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ বিবেচনা;

(গ) প্রার্থিত তথ্য প্রদানের সহিত একাধিক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট যুক্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহের শুনানী গ্রহণ।

(৪) আপীল আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ—

(ক) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন ; অথবা

(খ) তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীল আবেদনটি খারিজ করিতে পারিবেন।

(৫) আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করা হইতে বিরত থাকিবেন।”

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ তথা সর্বস্তরের জনগণ তাদের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিলে সার্বিকভাবে জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। সরকারি-বেসরকারি কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে, সুশাসন ও ন্যায়বিচারের ধারা জোরদার হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের দেহে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে সমুজ্জ্বল করতে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ তাই সবার কাম্য।

তথ্য অধিকার আইন সংবাদকর্মীদের খুব কম ক্ষেত্রেই প্রয়োজন পড়বে। দিনের রিপোর্ট করার জন্য এ আইনের আশ্রয় নিয়ে কাজ করার তেমন সুযোগ নেই। তবে অনুসন্ধানী বা ইনডেপ্থ রিপোর্ট , উন্নয়নমূলক বা গবেষণাধর্মী রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে আইনটির সহযোগিতা নিতে পারেন সংবাদকর্মীরা।